সভ্যতার ইতিকথা

আধুনিক যুগ

বন্দ্যোপাধ্যায় ও গুপ্ত

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক নবপ্রবর্তিত পাঠ্যক্রম (Circular No. Syll/11/81/2 Dated the 30th April, 1981) অনুযায়ী অষ্টম শ্রেণীর জন্য লিখিত।

সভ্যতার ইতিকথা

[আধুনিক যুগ]

(অষ্টম শ্রেণী)

অধ্যাপক নীহারেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ইতিহাস বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ
ও
অধ্যক্ষ স্বাধীন গুপ্ত
গুসকরা কলেজ, গুসকরা, বর্ধমান
প্রাক্তন অধ্যাপক, কৃষ্ণচন্দ্র কলেজ, হেতমপুর, বীরভূম

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : আধুনিক যুগ ১

দ্বিতীয় অধ্যায় : ইউরোপে রেনেসাঁস বা নবজাগরণ ... ৪

তৃতীয় অধ্যায় : ভৌগোলিক আবিষ্কার ১৬

চতুর্থ অধ্যায় : চার্চে ভাঙন—ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া ২২

পঞ্চম অধ্যায় : ইংল্যাণ্ডের বিপ্লব-সাধনা ৩৪

ষষ্ঠ অধ্যায় : মুঘল ভারত ৩৯

সপ্তম অধ্যায় : ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা ও বিস্তার ৫৭

অষ্টম অধ্যায় : অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী—বিপ্লবের যুগ ৬৮

নবম অধ্যায় : ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপ ... ৮৩

দশম অধ্যায় : চীন ও জাপানের ইতিহাস ... ১০১

একাদশ অধ্যায় : ব্রিটিশ রাজ্যের শাসনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮-১৯১৪) ... ১১১

দ্বাদশ অধ্যায় : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১২২

ত্রয়োদশ অধ্যায় : রুশ বিপ্লব ১৩৬

চতুর্দশ অধ্যায় : দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯) ... ১৪১

পঞ্চদশ অধ্যায় : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৪৯

ষষ্ঠদশ অধ্যায় : ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯১৯-১৯৪৭) ১৫৩

সপ্তদশ অধ্যায় : চীনের বিপ্লব ১৬৩

অনুশীলনী ... ... i—xx

ইতিহাসে কোন সমাজই শাশ্বত নয়। তোমরা জান, কালের বিবর্তনে প্রাচীন যুগের দাসপ্রথাভিত্তিক সমাজ মধ্যযুগে পরিবর্তিত হয়েছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক সমাজে। আবার কালের বিবর্তনেই সামন্ত প্রথাভিত্তিক সমাজে শুরু হল ভাঙন, ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হল আধুনিক যুগের শহর-শিল্পভিত্তিক সমাজে। পরিবর্তনের এই মূল সূত্রটি আছে অর্থনীতিতে রূপান্তরের মধ্যে।

॥ **রূপান্তরের মুখে সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি** ॥ দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে ইউরোপে সামন্ততন্ত্র পতনের দিকে এগোতে থাকে আর তার গ্রামীণ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি পরিবর্তিত হতে থাকে। সামন্ততন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ সামন্তপ্রভুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়ে। 'ক্রুসেডে' যোগ দিয়ে অনেকে মারা গেল, আবার অনেকে ফিরল নিঃস্ব হয়ে। অথচ প্রাচ্যের বিলাসব্যসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ায় তারা তাদের অবশিষ্ট জমি-জায়গা বন্ধক বা বিক্রি অথবা টাকাপয়সা ধার করতে লাগল সমাজের একটি উদ্যমী ও উঠ্‌তি শ্রেণীর কাছে। এরা হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী—এরা সামন্তপ্রভু নয়, ভূমিদাসও নয়—এদেরই মাঝামাঝি। প্রধানতঃ ব্যবসায়ী এই শ্রেণী 'ক্রুসেড' চলাকালে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র কেনা-বেচা করে ধনী হয়ে ওঠে। এরা সামন্তপ্রভুদের নেপথ্যে সরিয়ে সমাজ ও অর্থনীতিতে ক্রমশঃ মর্যাদার স্থান নিতে থাকে।

আবার গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা প্রকাশ পায়। কৃষি ও শিল্পের উৎপাদন প্রণালীতে উন্নতি ঘটতে থাকে। খনি থেকে লোহা তোলা এবং গলানো সহজ হলে লাঙ্গলের ফাল, কাস্তে ইত্যাদি অনেক কৃষি যন্ত্রপাতি তৈরি হল লোহা দিয়ে। আবার নতুন নতুন শহর গড়ে ওঠায় ও শহরবাসীর জনসংখ্যা বাড়তে থাকায় বনজঙ্গল সাফ করে চাষ-আবাদ করা

হতে থাকে। সার প্রয়োগের পদ্ধতির উন্নতি ঘটে। 'ক্রুসেডে'র ফলে নতুন নতুন শস্যের চাষ ও ফল বাগান তৈরি হতে থাকে। উৎপাদন বাড়তে থাকে। কিন্তু ক্রমশঃ চাষ-আবাদ ব্যয় ও ঝুঁকি-বহুল হয়ে ওঠে। গরীব কৃষকদের (যারা ভূমিদাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিল) পক্ষে চাষ-বাস করা শক্ত হয়ে পড়ে। এই সুযোগে ইউরোপের বহু অঞ্চলে বড় বড় জোতদার ও ধনী কৃষকেরা গরীব কৃষকদের জমি কিনে নিয়ে উন্নত প্রণালীতে চাষবাস করতে থাকল। উৎপাদন বাড়িয়ে প্রচুর মুনাফা তারা করতে লাগল। কোথাও কোথাও বিশেষতঃ ইংল্যাণ্ডে এরাই বহু জমি বেড়া দিয়ে ঘিরে মেষপালন করে পশমের ব্যবসায় খুব লাভবান হতে থাকল। অন্যদিকে ছোট ছোট জমির মালিক কৃষকরা ভূমিহীন হয়ে পরিণত হল দিন-মজুরে।

পরিবর্তনের ঢেউ বেশী করে লাগল শিল্পের উৎপাদনে। তোমরা জান যে 'ক্রুসেড'-এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এরপর চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে শিল্প-বাণিজ্যের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ইউরোপীয় মধ্যবিত্ত বণিকরা দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করত। ফলে সেকেলে ম্যানরের অর্থনীতি ভেঙ্গে যায়; টাকার প্রচলন হয়। জিনিসপত্র কেনাবেচার মাধ্যম হয় টাকা। নতুন নতুন ফসলের চাষ হওয়ায় অনেক শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া সম্ভব হয়। শিল্পজাত জিনিসের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। শিল্পজাত জিনিসপত্রের এই বর্ধিত চাহিদা মেটাতে এগিয়ে এল মধ্যবিত্ত সমাজের বণিকেরা। ব্যবসার দরুন (কেউ কেউ আবার উন্নত প্রণালীতে চাষ করার ফলে) এদের হাতে ছিল প্রচুর টাকা। সেই টাকার পুঁজি নিয়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে তারা গড়ে তোলে "ম্যানু-ফ্যাক্টরী" (ল্যাটিন শব্দ 'ম্যানু ফ্যাক্টাস্'—যার অর্থ 'হাত দিয়ে তৈরি' থেকে উদ্ভূত) বা ছোট ছোট কারখানার মাধ্যমে 'সমবেত হস্তোৎপাদন প্রথা।' আগের মত একটা সম্পূর্ণ জিনিস এক ধরনের কারিগরে তৈরি না করে তার বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন কারিগর তৈরি করতে লাগল। আবার আগেকার মত কারিগর ও ক্রেতার মধ্যে যে সরাসরি যোগাযোগ থাকত তা আর রইল না। কেননা

একদল মধ্যবিত্ত বণিক কারিগরদের টাকা দাদন বা কাঁচামাল সরবরাহ করে জিনিসপত্র তৈরি করিয়ে সেগুলো বিক্রির ব্যবস্থা করে লাভের সিংহভাগ নিতে লাগল। কারিগররা ক্রমশঃ এই দাদনদারদের অধীন হয়ে পড়ল। ছোট চাষীদের মতই তারা স্বাধীনতা হারিয়ে দিন-মজুরে পরিণত হল।

॥ **অর্থনীতিতে রূপান্তরের প্রতিক্রিয়া** ॥ অর্থনীতিতে রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-রাজনীতি-ধর্ম সব ক্ষেত্রেই লাগল পরিবর্তনের হাওয়া। শুধু সমাজ ও অর্থনীতিতেই নয়, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী সামন্তপ্রভুদের হটিয়ে প্রতাপশালী হয়ে ওঠে।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারুদের ব্যবহার সামন্ততন্ত্রের মূলে হানল চরম আঘাত। এর ফলে সামন্তপ্রভুদের নেতা রাজা কামান ও গুলিগোলা নিয়ে সামান্য একদল সৈন্যের সাহায্যে বিদ্রোহী সামন্তপ্রভুদের সৈন্যসামন্তকে চূর্ণ করতে পারতেন। তিনি তাই বেতনভোগী সৈন্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাল মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজস্বের মাধ্যমে। ফলে সামন্তপ্রভুদের ওপর রাজার নির্ভরশীলতা আর রইল না। অপরদিকে রাজা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়তে থাকল। এইভাবে আধুনিক যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হয়ে উঠল মধ্যবিত্তরা।

মধ্যবিত্তদের নেতৃত্বে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যেই তিনটি আন্দোলনের মাধ্যমে আধুনিক যুগ রূপ পরিগ্রহ করল। আন্দোলনগুলি মোটেই বিচ্ছিন্ন নয়। এগুলি হল—(১) 'রেনেশাঁস' বা নবজাগরণ (২) 'রিফরমেশন' বা ধর্ম-সংস্কার এবং (৩) 'রিভলিউশন' বা বিপ্লব। এগুলির বিস্তারিত আলোচনা পরে হবে। সংক্ষেপে 'রেনেশাঁস' হল একটি ভাবজগতের আন্দোলন, যার ফলে ঘটে প্রাচীন গ্রীক-রোমান সংস্কৃতির নবজন্ম। 'রিফরমেশন' হল চার্চের দুর্নীতি ও রোমের ধর্মীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। 'রিভলিউশন' হল রাজার নিরঙ্কুশ ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রিত ও সীমাবদ্ধ করার আন্দোলন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপে রেনেশাঁস বা নবজাগরণ

তোমরা জান, মধ্যযুগে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সুমহান সভ্যতা, উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞান প্রায় লোপ পেয়েছিল জার্মান বর্বর উপজাতিদের হাতে। পশ্চিম ইউরোপে সভ্যতার দীপশিখাটি কোন রকমে জ্বালিয়ে রেখেছিল খ্রীষ্টীয় চার্চ। ধর্মযাজকদের ওপর বিদ্যাচর্চার ভার পড়ে—খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্বই হয়ে ওঠে শিক্ষার প্রধান বিষয়। যাজকরা মানুষের পারলৌকিক সুখের জন্য পার্থিব সুখ বিসর্জন দিতে উপদেশ দিতেন। তাঁরা জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন ধর্মীয় নানান নিয়ম-নিষেধ আর অন্ধ সংস্কার। ধর্মীয় গোঁড়ামিতে শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান সাধনা প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানুষ হারিয়েছিল চিন্তার স্বাধীনতা। অবশেষে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে একটি আন্দোলন ইউরোপের মানুষের ধ্যানধারণা ও জ্ঞানের জগতে এক বিরাট আলোড়ন আনে। ইউরোপের ইতিহাসে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এই আন্দোলনের নাম **রেনেশাঁস** বা নবজাগরণ।

॥ **নবজাগরণের স্বরূপ** ॥ ইউরোপের ইতিহাসে নবজাগরণ একটি অসামান্য আন্দোলন। 'রেনেশাঁস' (শব্দটি ফরাসী) শব্দটির আক্ষরিক অর্থ 'পুনর্জন্ম'। সঙ্কীর্ণ অর্থে এটি বোঝায় ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা চর্চা এবং প্রাচীন সাহিত্য ও চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অতি ব্যাপক অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়—অনেকে এই আন্দোলনকে 'নবজাগরণ' বা 'নবজন্ম' আখ্যা দিয়েছেন। কেননা ইউরোপের এই জাগরণ প্রাচীন যুগের অন্ধ অনুকরণ নয়। এটি যেন একটি সম্পূর্ণ নতুন জিনিস। ধর্মীয় গোঁড়ামি আর কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষ যেন প্রাচীন গ্রীস ও রোমের শিল্প-সাহিত্য-দর্শন ও বিজ্ঞানের যাদুস্পর্শে প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে। প্রাচীন নিয়ম-নিষেধের বেড়াজাল ভেঙে মানুষের প্রতিভা শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ভাস্কর্য ও নতুন নতুন আবিষ্কারে শতমুখে বইতে শুরু করল। অবশ্য

আমরা যদি মনে করি জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় বা সংস্কৃতিতে ইউরোপের মধ্যযুগ ছিল একেবারে বন্ধ্যা, তা হলে ভুল হবে। মধ্যযুগে ছিল একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি যা ছিল ধর্মাশ্রয়ী।

কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের (১৪৫৩ খ্রীঃ) ফলে নবজাগরণের গতি দ্রুততর হয়েছিল। তুর্কীদের হাত থেকে পরিত্রাণের আশায় বহু গ্রীক ও রোমান পণ্ডিত অমূল্য পুঁথিপত্র নিয়ে ইটালীর বিভিন্ন শহরে আশ্রয় নেন। ফলে সেখান থেকে গ্রীক ও রোমান সংস্কৃতির আলো সারা পশ্চিম ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। নবজাগরণের পথ প্রশস্ত হয়। কিন্তু কন্‌স্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলেই নবজাগরণ দেখা দিয়েছিল—একথা ভাবলে ভুল হবে। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগেই এর সূচনা হয়েছিল। প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও চিন্তাধারা ইটালী বা পশ্চিম ইউরোপের কাছে কোন নতুন জিনিস ছিল না। শিক্ষিত মানুষ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করত। অবশ্য শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল খুবই কম। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নবজাগরণের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল। বিবর্তনের পথ ধরে সেই প্রচেষ্টা পূর্ণতা পেল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে।

নবজাগরণ মানুষের চলতি ভাবধারায় এনেছিল আমূল পরিবর্তন আর এর প্রকাশ ঘটেছিল কয়েকটি ধারায়। প্রথমতঃ, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান জ্ঞানচর্চা ও চিন্তাধারার পুনরুজ্জীবন ঘটে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমান পুঁথিপত্রের অনুসন্ধান চলতে থাকে। এর জন্যে মানুষ মঠ-গির্জার গ্রন্থাগারগুলি লুঠ পর্যন্ত করতে থাকে। পণ্ডিতজনেরা সেই জ্ঞানচর্চার অমৃত পান করেন। এর সূত্র ধরে বৈজ্ঞানিক সত্য আর নির্ভুল তথ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগল মানুষের মনে। দ্বিতীয়তঃ, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে গ্রীক ও রোমানদের দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ। মধ্যযুগে চার্চ মানুষকে শিখিয়েছিল যে, এই পৃথিবী কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার স্থান আর মানুষের এই জীবন পরকালের উন্নত জীবনের জন্য উৎসর্গ করতে হবে। কিন্তু গ্রীক ও রোমানদের চোখে এই পৃথিবী হল অপার সৌন্দর্য ও বিস্ময়ে ভরা এক রমণীয় স্থান। মানুষ এই অপার বিস্ময়ের রহস্যভেদ

করবে। জীবনকে উপভোগ করবে। পরলোক চর্চায় সে নিজেকে লিপ্ত না রেখে ঘটাবে ইহজীবনের উন্নতি। তাই মানুষের মনে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জেগেছিল প্রচণ্ড কৌতূহল আর অনুসন্ধিৎসা। সে বিশ্বাস করত না প্রাকৃতিক জগতে যা ঘটছে তা ঈশ্বরেরই কাজ। ক্যাথলিক চার্চ মধ্যযুগীয় অন্ধ বিশ্বাস, তন্ত্র-মন্ত্র ইত্যাদি বজায় রাখার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু নবজাগরণের মানুষ এ সবের জায়গায় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে সন্ধানী দৃষ্টি দিয়ে দেখতে থাকে। তৃতীয়তঃ, সর্ববিষয়ে যুক্তিবাদ গ্রহণ। গ্রীক ও রোমানরা মনে করতেন, ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ দান হচ্ছে মানুষের যুক্তিবাদী মন আর জ্ঞানলাভের সব চেয়ে ভাল উপায় হল স্বাধীনভাবে এই যুক্তিবাদের প্রয়োগ। নবজাগরণের প্রভাবে মানুষ তাই যুক্তিতর্কের দিকে ঝুঁকতে থাকে, প্রচলিত বিশ্বাসকে সে নিজের অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের নিরিখে যাচাই করতে থাকে। এইভাবে গড়ে উঠতে থাকে তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী। মনে রাখা দরকার যে, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকেই এই দৃষ্টিভঙ্গী একটু একটু করে গড়ে উঠছিল।

॥ ইটালীতে নবজাগরণ আরম্ভ হওয়ার কারণ ॥ ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে ইটালীতেই সর্বপ্রথম নবজাগরণের সূত্রপাত হয়। ইটালী ছিল প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র—কন্স্ট্যান্টিনোপলের পতনের আগেই সেখানে গ্রীক ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হত। তা ছাড়া, সেখানে প্রাচীন গ্রীস ও রোমের সভ্যতার অসংখ্য শিল্প-নিদর্শন ভগ্নস্তূপের মধ্যে ছড়ানো ছিল। এগুলি ইটালীয়দের অনুপ্রাণিত করত প্রাচীন গৌরবোজ্জ্বল দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনতে। এছাড়া, মধ্যযুগের শেষদিকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সেজন্য বহু প্রভাবশালী লোক এই অঞ্চলে অর্থাৎ ইটালীর নগর-রাষ্ট্রগুলিতে বসবাস করতেন। বাণিজ্য উপলক্ষে নানা দেশের সঙ্গে যোগাযোগ থাকায় এঁদের মন সঙ্কীর্ণ চিন্তাধারা থেকে মুক্ত ছিল। এঁরা এবং শাসকরা শিল্প-সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করতে থাকেন। ফলে নব-জাগরণ আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই অবস্থায়

কনস্ট্যান্টিনোপল থেকে গ্রীক ও রোমান পণ্ডিতরা তাদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইটালীতে এলেন। নবজাগরণের গতি দ্রুততর হয়ে ওঠে।

॥ **নবজাগরণের বিস্তৃতি** ॥ নবজাগরণ প্রথম দেখা দেয় ইটালীর শহর ফ্লোরেন্সে। সেখান থেকে এর প্রভাব ছড়ায় মিলান, রোম ও ইটালীর অন্যান্য শহরে। এরপর এই আন্দোলনের প্রভাব আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়তে থাকে জার্মানি, ফ্লাণ্ডার্স, নেদারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স এবং ইংল্যাণ্ডে।

চিন্তার ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা মানবতাবাদ

পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতদের ল্যাটিন-গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যচর্চা থেকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল। তাঁরা সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছিলেন যে ঐ সাহিত্যে এই জগতের কৃচ্ছ্র-সাধনার বা স্বর্গরাজ্যের কথা নেই, সেখানে আছে মানুষের আশা-আনন্দের কথা। এমনকি দেবতারাও সেখানে রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে চিত্রিত। তাই নবজাগরণের মনীষীরা আবার মানুষের জয়গান গাইলেন—মানুষের দেহমনের সৌন্দর্য ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তুললেন। তাঁদের রচনায় মুখ্য স্থান পেল মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আনন্দ—মানুষের পারলৌকিক জীবন নয়, পার্থিব জীবন। তাঁদের রচনার মুখ্য চরিত্র মধ্যযুগীয় 'নাইট' নয়, সাধারণ মানুষ। তাই এই মনীষীদের বলা হয় 'হিউম্যানিস্ট' বা মানবতাবাদী।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের বহু দেশে জাতীয় চেতনা দেখা দেয় এবং মানবতাবাদী কবি ও সাহিত্যিকরা চার্চ ও পণ্ডিতজনের ব্যবহৃত ল্যাটিন ভাষা বাদ দিয়ে জনসাধারণের বোধগম্য স্থানীয় ভাষায় সাহিত্য রচনায় এগিয়ে আসেন। এ ব্যাপারে ইটালীর ভাষা হল সবচেয়ে বেশী অগ্রগামী। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতেই ইটালীয় ভাষায় সাহিত্য রচনায় সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন কবি দান্তে আলিঘিয়রী এবং পরে ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্ক।

দান্তেঃ ফ্লোরেন্সবাসী কবি দান্তে আলিঘিয়েরী (১২৬৫-

১৩২১ খ্রীঃ) হলেন মধ্যযুগ ও নবজাগরণের মধ্যে সেতুবন্ধের মত। তিনিই প্রথম ইটালীয় যিনি নিজ মাতৃভাষায় কাব্য রচনা করেছিলেন। তাই তিনি ইটালীতে নবজাগরণের অগ্রদূত বলে অভিহিত হন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম এই কবি রচনা করেছিলেন অমর মহাকাব্য 'ডিভাইন কমেডি'। এতে স্বর্গ ও নরকের বর্ণনা আছে, আছে মধ্যযুগীয় দর্শন, ধর্মতত্ত্ব ও নীতিবোধের কথা। এরই সঙ্গে আছে মানুষের চিরন্তন আনন্দ-বেদনার কথা। দান্তে 'ভিটা নুভা' বা নবজীবন নামে আর একটি কাব্য রচনা করেছিলেন।

পেত্রার্ক ঃ ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্ক (১৩০৪-১৩৭৪ খ্রীঃ) পেত্রার্কীয় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনার ধারা প্রবর্তন করে যশস্বী হয়ে আছেন। তাঁর প্রাচীন ল্যাটিন সাহিত্যপ্রীতি এবং গ্রীক ভাষায় দখল না থাকলেও তিনি গ্রীক সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। তাঁর রচনায় মানবজীবনেরই জয়গান। তিনি বিদ্বান, কবি ও সমালোচক হিসেবে গৌরবের অধিকারী হয়েছিলেন।

মেকিয়াভেলি ঃ নিকোলো মেকিয়াভেলি (১৪৬৯-১৫২৭ খ্রীঃ) ফ্লোরেন্সবাসী একজন ধুরন্ধর কূটনীতিবিদ্। তাঁর রচিত বিখ্যাত বই-এর নাম *'দ্য প্রিন্স'*—এতে বলা হয়েছে শাসক তাঁর রাজ্য বজায় রাখতে গেলে ব্যক্তিগত নীতিবোধ বিসর্জন দিতে কুণ্ঠিত হবেন না। এতে আছে কূটনীতি ও চাতুর্যের সঙ্গে কিভাবে দেশ শাসন করতে হয় তার নানান নির্দেশ।

বোকাচ্চিও ঃ পেত্রার্কের সমসাময়িক একজন ইটালীয় প্রতিভাধর সাহিত্যিক খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইনি হলেন জিওভান্নি বোকাচ্চিও (১৩১৩-১৩৭৫ খ্রীঃ)। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ **'ডেকামেরন'**। এটি কতকগুলি ছোট গল্পের সংকলন। সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা এগুলির বিষয়বস্তু। এগুলিতে সামন্তপ্রভু ও ধর্মযাজকদের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রূপও আছে।

চসার ঃ জিওফ্রে চসার (১৩৪০-১৪০০ খ্রীঃ) ইংরেজী কাব্য-

সাহিত্যের জনক। মানবতাবাদ তাঁর রচনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর রচিত অসমাপ্ত কাব্য 'ক্যাণ্টারবেরী টেলস' আজ ইংরেজী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এতে দেবতা ও বীরদের কথা নেই, আছে সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথা। বাস্তব জীবনের চেনা মানুষই হল এর প্রতিটি চরিত্র। মানুষের প্রতি কবির অপার মমতা এই কাব্যে ফুটে উঠেছে।

জিওফ্রে চসার

নবজাগরণের প্রভাবে যে নব-চেতনা দেখা দিয়েছিল তার ফলে ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথের রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৬০৩ খ্রীঃ) ইংরেজী সাহিত্য গৌরবের শীর্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। এইসব মানবতাবাদী ইংরেজ সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন, স্পেন্সার এবং শেক্সপীয়ার।

স্যার ফ্রান্সিস বেকন: এলিজাবেথীয় যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন একাধারে রাজনীতিবিদ্, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, আইনবিশারদ ও সাহিত্যিক। তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'এসেজ' বা প্রবন্ধগুলি। এগুলি তাঁর প্রখর যুক্তিবাদ, পাণ্ডিত্য ও স্বচ্ছ প্রকাশভঙ্গীতে উজ্জ্বল।

স্পেন্সার: এডমণ্ড স্পেন্সার (১৫৫২-১৫৯৯ খ্রীঃ) একজন যশস্বী ইংরেজ কবি। তাঁর কাব্যে পৃথিবীর সৌন্দর্য-মাধুর্যের বিহ্বলতা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রচিত কাব্য **'শেফার্ডস ক্যালেণ্ডার'**-এ গ্রাম্যজীবন ও প্রকৃতি চিত্রিত হয়েছে। রূপক কাব্য **'ফেয়ারী কুইন'** হচ্ছে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। এ'তে জীবনের পাপপুণ্য, ন্যায়-অন্যায়ের দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে—এই দ্বন্দ্বে জয়ী হয়েছে পুণ্য ও ন্যায়।

উইলিয়ম শেক্সপীয়ার ঃ উইলিয়ম শেক্সপীয়ার (১৫৬৪–১৬১৬ খ্রীঃ) শুধু তাঁর সমকালীন পৃথিবীতে নয়, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার বলে গণ্য হতে পারেন। তাঁর অসংখ্য নাটকের মধ্যে মিলনাত্মক নাটক—'কমেডি অব্ এররস্', 'মার্চেণ্ট অব ভেনিস', 'এজ ইউ লাইক ইট', এবং বিয়োগাত্মক নাটক—'হ্যামলেট', 'কিং লীয়ার', 'ওথেলো,' 'জুলিয়াস সীজার', 'ম্যাকবেথ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শেক্সপীয়ার সর্বস্তরের চরিত্র চিত্রণে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তাঁর কল্পনা ও ভাষার চমৎকারিত্বে ও গভীর মানবিকতাবোধে নাটকের সব চরিত্র জীবন্ত হয়ে ওঠে। এছাড়া, তিনি কাব্যকাহিনী ও চতুর্দশপদী কবিতা রচনায়ও নিজ প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন।

উইলিয়ম শেক্সপীয়ার

ইরাসমাস ঃ ডেসিডেরিয়াস ইরাসমাস (১৪৬৬-১৫৩৬ খ্রীঃ) নেদারল্যাণ্ডের মানবতাবাদী সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, বহুভাষাবিদ্ ও রাজনীতিবিদ্। প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ ছিল। নিজে ধর্মযাজক হয়েও ছদ্মনামে কবিতায় একগুচ্ছ চিঠি লেখেন—এগুলিতে ধর্মযাজকদের নির্বুদ্ধিতা ও ঔদ্ধত্যকে কৌতুকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য ল্যাটিন ভাষায় 'প্রেইজ অব্ ফলি' লিখেই তিনি খ্যাতিমান হন। সমস্ত ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত এই মজার বইটিতে তিনি নবজাগরণের নতুন বিদ্যার জয়গান গেয়েছেন। তা ছাড়া রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, ধর্মযাজকদের নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতা এবং শিক্ষার নিম্নমানকে এতে তীব্রভাবে বিদ্রূপ করা হয়। তাঁর সমস্ত লেখায় গির্জার যাবতীয় দুর্নীতির সংস্কার ও খ্রীষ্টধর্মের পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব থাকত।

সারভান্তিস্ : নবজাগরণের যুগে স্পেনীয় সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই যাঁর নাম করতে হয় তিনি হলেন সারভ্রান্তিস্ (১৫৪৭-১৬১৬ খ্রীঃ)। যে বইটির জন্য তাঁর অসামান্য খ্যাতি তার নাম **'ডন কুইক্সোট'**। এই বইটিতে সেকালের নাইটদের বীরত্বের গর্ব যে কত অসার তা পরিহাসের ছলে তিনি দেখিয়েছেন। ষোড়শ শতাব্দীর স্পেনীয় সমাজের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে এই বইটি।

রাবেলে : নবজাগরণের যুগে ফরাসী সাহিত্যে রাবেলে (১৪৯০-১৫৫৩ খ্রীঃ) ছিলেন একজন মানবতাবাদী শক্তিমান লেখক। তিনি দীর্ঘকাল কাটিয়েছিলেন মঠে, কিন্তু মঠবাসীদের অন্ধ কুসংস্কার মেনে নিতে পারেন নি। তাঁর লেখায় আছে ধর্মজীবনের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্রূপ। এঁর বিখ্যাত বই 'গার্গাণ্টুয়া'। ইনি বিজ্ঞান চর্চাও করতেন।

শিল্পকলায় নবজাগরণ

নবজাগরণের নবচেতনার স্পর্শ লেগেছিল শিল্পকলাতেও। চিত্রশিল্প, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে প্রতিভার সমাবেশে ইউরোপ আলোকিত হয়ে উঠেছিল। এসব ক্ষেত্রে ইটালীর শিল্পীদের অবদান ছিল অসাধারণ। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, রাফায়েল ও মাইকেল এঞ্জেলো।

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চিঃ লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি (১৪৫২-১৫১৯ খ্রীঃ) এক বিস্ময়কর প্রতিভা। তিনি ছিলেন একাধারে চিত্রকর, ভাস্কর, সঙ্গীত শিল্পী, দার্শনিক ও

বিজ্ঞানী। তাঁর প্রসিদ্ধ ছবিগুলির মধ্যে 'দি ভার্জিন অব্ দি রকস,' 'দি লাস্ট সাপার', 'মো না লি সা' ভু ব ন জয়ী। 'মোনালিসা' ছবিটি সবচেয়ে প্রাণবন্ত আর এর আশ্চর্য রং ও আলোছায়ার খেলা, রহস্যময় হাসি আজও দর্শকদের এক দুর্নিবার আকর্ষণ।

মোনালিসা

মাইকেল এঞ্জেলো : মাইকেল এঞ্জেলো (১৪৭৫-১৫৫৪ বা ১৫৬৪ খ্রীঃ) ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প, দুটোতেই মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। স্থাপত্য ও কাব্য রচনাতেও তিনি দক্ষ ছিলেন। তাঁর গড়া শ্রেষ্ঠ মূর্তি হল 'মোজেস', 'ডেভিড' ইত্যাদি। রোমের পোপের অনুরোধে তিনি প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে ভ্যাটিকানের সিস্টাইন চ্যাপেলের ছাদে ছবি আঁকেন। এগুলির মধ্যে 'ক্রিয়েশন অব্ অ্যাডাম' বা মানব সৃষ্টি, 'খ্রীষ্টের সমাধি' এবং 'লাস্ট জাজমেণ্ট' বা শেষ বিচার আজও দর্শকদের বিস্ময় জাগায়।

রাফায়েল : চি ত্র ক লা র ইতিহাসে বি শ্রু ত কী র্তি র অধিকারী হয়ে আছেন রাফায়েল (১৪৮৩-১৫২০ খ্রীঃ)। তাঁর আঁকা 'ম্যাদোনা' (খ্রীষ্টমাতা) ছবিগুলিতে দেখা যায় এক অনির্বচনীয় স্নিগ্ধ দ্যুতি। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির মধ্যে 'লা ম্যাদোনা দেল গ্রান্ দুকা' ও সিস্টাইন গির্জায় আঁকা 'সিসটাইন ম্যাদোনা' উল্লেখযোগ্য।

ম্যাদোনা

বিজ্ঞান চর্চায় নবজাগরণ

রোজার বেকন ঃ বিজ্ঞান চর্চায় নবজাগরণের অবদান মোটেই নগণ্য নয়। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ ছিলেন একজন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক সন্ন্যাসী। তাঁর নাম রোজার বেকন (১২১৪ ?-১২৯৪ খ্রীঃ)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইনি 'অ্যালকেমি' বা রসায়ন বিদ্যা ও দৃষ্টি-বিজ্ঞান নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন। তিনিই ইউরোপে সর্বপ্রথম চশমার জন্য 'লেন্স' বা কাঁচ ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি বারুদ তৈরির সূত্র আবিষ্কার করেছিলেন। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর কতকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী আশ্চর্যভাবে মিলে গেছে আধুনিক কালে, যেমন—অশ্ববিহীন যান (অর্থাৎ মোটর গাড়ি), পালবিহীন জাহাজ (অর্থাৎ ষ্টীমার), হাওয়ায় ভাসা যন্ত্র (অর্থাৎ উড়োজাহাজ), ভারোত্তোলনকারী যন্ত্র (অর্থাৎ ক্রেন) এবং ঝুলন্ত সেতু। তিনি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার ওপর জোর দিতেন এবং তাঁকে যথার্থই **'আধুনিক বিজ্ঞানের জনক'** বলা হয়। তাঁর বিখ্যাত বই **'ওপাস মাইয়াস'**-এ অঙ্ক, পদার্থ বিদ্যা, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মত প্রকাশিত হয়েছে—এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণের নাম **'ওপাস মাইনাস।'**

স্যার ফ্রান্সিস বেকন ঃ স্যার ফ্রান্সিস বেকন (১৫৬১-১৬২৬ খ্রীঃ) মনে করতেন যে, গভীর পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে বিজ্ঞান-সাধকদের কর্তব্য। বিশুদ্ধ জ্ঞানের জন্য এই পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলেও তাঁর বিশ্বাস ছিল এগুলি একদিন মানুষের কল্যাণসাধন করবে। 'তাপ হচ্ছে একপ্রকার শক্তি' আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের এই তত্ত্বের কাছাকাছি তিনি পৌছে-ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই ল্যাটিন ভাষায় রচিত **'নোভাম অর্গানাম'** (নতুন প্রণালী)।

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি ঃ বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির বিজ্ঞান চর্চাতেও কৃতিত্ব কম নয়। তাঁর লেখা **'নোট বুক'** অগোছালোভাবে লেখা হলেও তা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আকর। পরবর্তীকালে তাঁরই সূত্র ধরে আবিষ্কৃত হয়েছে উড়োজাহাজ, কামান, সাঁজোয়া গাড়ী, অধিবৃত্তাকার কম্পাস এবং 'প্যারাস্যুট' বা

বিমানছত্র। দৃষ্টিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল। মানবদেহের গঠন সম্বন্ধেও তিনি চর্চা করতেন।

কোপার্নিকাস: পোল্যাণ্ডের জ্যোতির্বিদ কোপার্নিকাসের (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) অবদানে জ্যোতির্বিদ্যা সমৃদ্ধ হয়। পৃথিবীই হল বিশ্বের কেন্দ্রস্থল এবং সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র রাজি পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে—দীর্ঘদিনের এই ভুলটির পরিবর্তে কোপার্নিকাস প্রমাণ করেন যে, সূর্য হচ্ছে সৌরজগতের কেন্দ্র এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগুলি তার চারিদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে। এই তত্ত্বটি অবশ্য তাঁর আবিষ্কৃত নয়, এটি প্রাচীন জ্যোতির্বিদ অ্যারিস্টার্কাস-এর। কিন্তু কোপার্নিকাস ঐ তত্ত্বটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এই মত অবশ্য তাঁর যুগে গৃহীত হয় নি।

কোপার্নিকাস

গ্যালিলিও: জ্যোতির্বিদ্যায় অসামান্য অবদান রেখে গেছেন ইটালীয় জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিও গ্যালিলাই (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীঃ)। তিনি গতিবিদ্যা ও স্থিতিবিদ্যারও জনক। তিনি নিজের হাতে সর্বপ্রথম দূরবীণ যন্ত্র তৈরি করেন এবং সেটিকে আকাশ পর্যবেক্ষণের কাজে

গ্যালিলিও

লাগান। তিনি আবিষ্কার করেন যে, চাঁদের জমি আদৌ মসৃণ নয়—তার ওপর পাহাড় আছে, আছে আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। চাঁদের মত শুক্রগ্রহেরও কলার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটতে দেখেন তিনি। এতে প্রমাণিত হয় শুক্রগ্রহ সূর্যের আলোকই প্রতিফলিত করে, নিজস্ব আলোক তার নেই। সূর্যের চারদিকে গ্রহরা ঘুরছে—কোপার্নি-কাসের এই তত্ত্বকে তিনি জোরালোভাবে সমর্থন করেন। তিনি তাঁর সমস্ত মত ইটালীয় ভাষায় লিখেছিলেন একটি ছোট বইয়ে। তাঁর এই সমস্ত মতবাদের জন্য ক্যাথলিক চার্চ তাঁর ওপর কম অত্যাচার করে নি। শেষ পর্যন্ত নিজের ঘরে অন্তরীণ অবস্থায় অন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

॥ **মুদ্রণ কৌশল উদ্ভাবন ও জোহান গুটেনবার্গ** ॥ মানবসভ্যতার ইতিহাসে নবজাগরণের অন্যতম অবদান মুদ্রণ শিল্প। পঞ্চদশ শতাব্দীর আগে হাতে-লেখা পুঁথি শিক্ষার্থীকে পড়তে হত। স্বাভাবিক-ভাবেই তাতে অনেক ভুলভ্রান্তি থেকে যেত আর পুঁথিগুলি মোটেই সহজলভ্য ছিল না। কিন্তু মুদ্রণ কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ায় সুলভে ও সহজে প্রচুর বই যোগাড় করা সম্ভব হয়। জনসাধারণের কাছে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা সহজ হওয়ায় নবজাগরণ আন্দোলন দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ব্লকের পরিবর্তে বার বার ব্যবহারের উপযোগী অক্ষরের (যাকে বলা হয় 'মুভেবল টাইপ') মাধ্যমে ছাপাতে শুরু করেন জার্মানির জোহান গুটেনবার্গ। অধিকাংশের মতে ইউরোপে এই মুদ্রণ কৌশল উদ্ভাবনের কৃতিত্ব তাঁরই। তিনিই প্রথম ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বাইবেল ছেপেছিলেন।

———

মধ্যযুগে ইউরোপবাসীরা 'বিপুলা এই পৃথিবী'র সম্বন্ধে অতি অল্পই জানত। পৃথিবী যে গোল সমতল রেখায় বিস্তৃত নয়, সে ধারণাও তাদের ছিল না। তেমনি ধারণা ছিল না বিভিন্ন মহাদেশ, দেশ ও জাতি সম্বন্ধে।

নবজাগরণের যুগের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল ভৌগোলিক আবিষ্কার। ইউরোপীয় জাতিগুলি নতুন নতুন দেশ আবিষ্কারে মেতে ওঠে। এ ব্যাপারে তাদের প্রেরণা যুগিয়েছিল সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির রূপান্তর এবং নবজাগরণ-প্রসূত অনুসন্ধিৎসা। মধ্যযুগে ব্যবসা-বাণিজ্য বা সমুদ্রযাত্রায় ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার কোন সুযোগ ছিল না—শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত হত 'গিল্ড' বা শিল্পীসংঘের দ্বারা; কিন্তু নবজাগরণের যুগে পরিবর্তিত অর্থনীতিতে সেই নিয়ন্ত্রণ আর রইল না। এছাড়া, নবজাগরণ এক অভূতপূর্ব প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। অজানাকে জানার অদম্য কৌতূহল দেখা দিয়েছিল মানুষের মনে। তাই উদ্যমী ও দুঃসাহসী মানুষ এগিয়ে এল একটার পর একটা সামুদ্রিক অভিযানে। ইতিমধ্যে **'কম্পাস'** বা দিক্-নির্ণয় যন্ত্র এবং **'অ্যাসট্রোলেব'** বা অক্ষাংশনির্ণয় যন্ত্র আবিস্কৃত হয়েছে। ফলে প্রস্তুত হয়েছে নানা রকম ম্যাপ, চার্ট ইত্যাদি। সুতরাং অজানা সমুদ্রে দিক্‌ভ্রম হয়ে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

॥ **ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ** ॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারের পেছনে নিছক অদম্য কৌতূহলই ছিল না, এর মূলে ছিল বাণিজ্য বিস্তারের ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রেরণা। প্রাচ্যদেশ বিশেষতঃ ভারতবর্ষের প্রবাদতুল্য ধনরত্নের আকর্ষণ ইউরোপীয় বণিকদের এড়ানো সম্ভব ছিল না। ভারতবর্ষ থেকে যে-সব বাণিজ্যদ্রব্য ইউরোপে যেত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—হাতীর দাঁতের জিনিস, রেশম, তুলো, সোনা-রূপো ও দামী পাথর। সবচেয়ে কদর বেশী ছিল মসলার, যাতে খাদ্য সুস্বাদু হত। কিন্তু

কন্‌স্টান্টিনোপলের পতন ঘটলে পূর্বদিকের জল ও স্থলপথ (অর্থাৎ যে পথে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে বাণিজ্য চলত) তুর্কীদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তাই ইউরোপীয় বণিক ও অভিযাত্রীদল প্রাচ্যদেশে পৌঁছুনোর নতুন পথের সন্ধান করতে লাগল। নতুন নতুন দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করা যাবে—এই আশায় ধর্মপ্রচারকরাও বণিকদের সহযাত্রী হল।

॥ সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগাল ॥ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগাল অন্যান্যদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছিল।

সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগালের কৃতিত্বের কথা মনে হলে প্রথমেই যাঁর নাম মনে আসে তিনি হলেন নৌবিদ্যা-বিশারদ পর্তুগালের রাজকুমার **প্রিন্স হেনরী**। তিনি আফ্রিকার অধিবাসীদের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন ও তাদের খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার উদ্দেশ্যে একাধিকবার নাবিকদের পাঠিয়েছিলেন আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে। এরপর ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগালের রাজার নির্দেশে **বার্থোলোমিউ দিয়াজ** আফ্রিকার দক্ষিণ অংশ ঘুরে যান। ঝড়-ঝাপ্‌টার মধ্য দিয়ে তিনি যে অন্তরীপে পৌছান তার নাম দেন ঝটিকা অন্তরীপ। কিন্তু পর্তুগালের রাজা পরে এর নামকরণ করেন উত্তমাশা অন্তরীপ, কেননা তাঁর আশা হয়েছিল যে, এই অন্তরীপ আবিষ্কারের ফলে ভারতে পৌছনো যাবে। বারো বছর পরে দিয়াজের পথ ধরে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে পৌছান (১৪৯৮ খ্রীঃ) **ভাস্কো-ডা-গামা**। এরপর পর্তুগীজ বণিকরা দলে দলে ভারতে আসতে থাকে। এরা আরব বণিকদের ওপর অত্যাচার করতে থাকে, কালিকটের হিন্দুরাজা জামোরিনের সঙ্গে বিবাদ বাধায়। পর্তুগাল **আলবুকার্ক**কে পর্তুগীজদের গভর্নর করে পাঠায়। তিনি ভারতে পর্তুগীজ শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পর্তুগীজরা গোয়া, দমন, দিউতে বাণিজ্য করতে শুরু করে। এদিকে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে কেব্রাল নামে জনৈক পর্তুগীজ আমেরিকার ব্রেজিলে পর্তুগীজ আধিপত্যের সূচনা করেন।

॥ সামুদ্রিক অভিযানে স্পেন ॥ সামুদ্রিক অভিযানে পর্তুগালের পরেই স্পেনের স্থান। পর্তুগীজরা গিয়েছিল পূর্বদিকে, স্পেনীয়রা পশ্চিমে। জেনোয়ার গরীব ঘরের ছেলে **কলম্বাস** ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম দিকে গিয়ে প্রাচ্যদেশে পৌছনো যায় কিনা তা জানার জন্য আটলান্টিক্ পাড়ি দিয়েছিলেন। তাঁকে তিনটি ছোট জাহাজ দিয়ে সাহায্য করেছিলেম স্পেনের রাজা ও রানী ফার্ডিনাণ্ড ও ইসাবেলা। উনসত্তর দিন সমুদ্রযাত্রার পর তিনি স্থলভাগের দেখা পান। কলম্বাস ধরে নিয়েছিলেন ঐটিই ভারতবর্ষ। আসলে অঞ্চলটি ছিল 'ওয়েস্ট ইণ্ডিজ'-এর একটা দ্বীপ বা বর্তমান আমেরিকা মহাদেশের দক্ষিণ ভাগ। আমৃতু তাঁর এই ভুলটি ভাঙে নি, আর নামকরণে এই ভুলটি স্থায়ী হয়ে গেছে। দ্বীপগুলি আজও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা 'রেড ইণ্ডিয়ান' নামে পরিচিত।

কলম্বাসের আবিষ্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই নতুন আবিষ্কৃত দেশগুলির অধিকার নিয়ে স্পেনীয় ও পর্তুগীজ নাবিকদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। দুই খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের এই বিবাদ বন্ধের জন্যে পোপ এক অনুশাসন জারী করেন (১৪৯৩ খ্রীঃ)। পশ্চিম আফ্রিকার অদূরে কেপ ভার্ডে দ্বীপপুঞ্জের কয়েক শো মাইল পশ্চিমে আটলান্টিক সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে একটি কাল্পনিক রেখা টানা হল। এই রেখার পশ্চিমের দেশগুলি স্পেনের অংশে, আর পূর্বের দেশগুলি পর্তুগালের অংশে পড়ে।

কলম্বাস

কলম্বাসের পর **আমেরিগো ভেসপুচি** নামে জনৈক নাবিক আমেরিকায় পৌছান। তখন জানা যায় এটি একটি নতুন মহাদেশ এবং তাঁর নামানুসারে এর নামকরণ হয় 'আমেরিকা'।

উত্তর আমেরিকা
ইউরোপ
এশিয়া
আফ্রিকা
ভারতবর্ষ
কালিকট
ভারত মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া
প্রশান্ত মহাসাগর
আটলান্টিক মহাসাগর
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীঃপুঃ
দক্ষিণ আমেরিকা
উত্তমাশা অন্তরীপ
ম্যাগেলান প্রণালী
কলম্বাস
ভাস্কোডাগামা
ম্যাগেলান
ক্যাবট
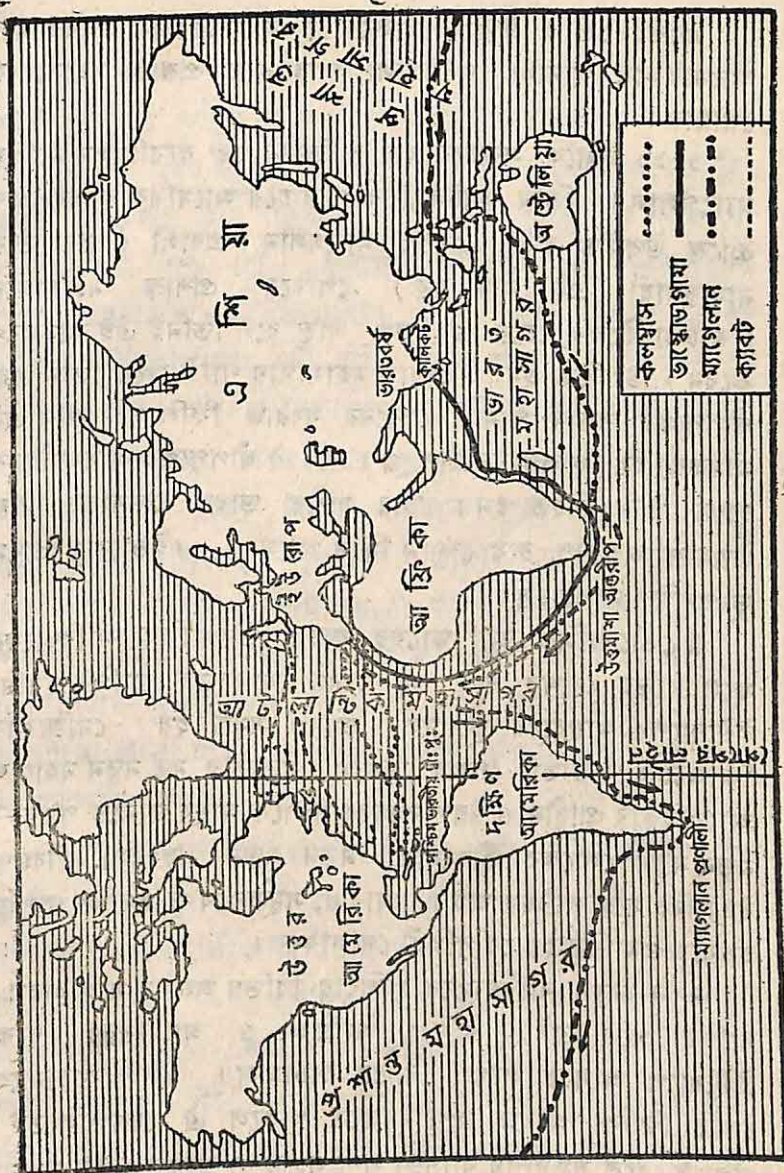
এরপর ১৫:৩ খ্রীষ্টাব্দে বালবোয়া নামে একজন নাবিক মধ্য আমেরিকায় পানামা পর্বতমালা পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌছান।

১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু করেছিলেন নাবিক ম্যাগেলান। তিনি আটল্যান্টিক পার হয়ে আমেরিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্তে উপনীত হন। এরপর ম্যাগেলান প্রণালী (পরে তাঁর নামানুযায়ী এই নাম হয়) পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে (আটল্যান্টিকের চেয়ে এর জল শান্ত বলে তিনিই এই নামকরণ করেন) উপস্থিত হন। প্রশান্ত মহাসাগার পাড়ি দিয়ে তিনি এক দ্বীপপুঞ্জের সন্ধান পান। স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নামে এর নামকরণ হয় ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ। পথে ঐ দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসীদের হাতে তিনি নিহত হন। তাঁর সঙ্গীরা ভারত মহাসাগর দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে স্পেনে ফিরে আসেন। এইভাবে সর্বপ্রথম ভূ-প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হয়।

॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফল ॥ ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে শুধু ঘনিষ্ঠ যোগসূত্রই স্থাপিত হয়নি, ইউরোপের মানুষদের ভূগোলের জ্ঞানও সমৃদ্ধ হয়। মেক্সিকোর 'আজটেক সভ্যতা, পেরুর 'ইনকা' সভ্যতার মত নতুন মহাদেশ আমেরিকার প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতা সম্পর্কে মানুষ জানতে পারে—নতুন নতুন লোকের জীবনযাত্রা, নতুন নতুন গাছপালা, জীবজন্তু ইত্যাদির সঙ্গে পরিচয় ঘটে। আবার, সমুদ্রপথে ভূ-প্রদক্ষিণ সম্পন্ন হওয়ায় প্রমাণিত হয় যে পৃথিবী গোলাকার।

নতুন নতুন বাণিজ্যপথে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে ওঠে। এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে ইউরোপে আসতে লাগল বিভিন্ন কাঁচামাল। সেই কাঁচামালে তৈরি জিনিস আবার রপ্তানি হতে থাকলে ঐ দেশগুলিতেই। স্থলপথ থেকে সমুদ্রপথে বাণিজ্য পণ্য সহজে ও সুলভে নিয়ে যাওয়া যেত। ব্যবসা-বাণিজ্যের এইভাবে ব্যাপক প্রসার ঘটে। স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিগত ছোট বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের জায়গায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় বড় বড় যৌথ বাণিজ্য-সংস্থা

গড়ে ওঠে। আবার এই বাণিজ্যের সূত্র ধরেই ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে স্থাপন করল উপনিবেশ। ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যস্পৃহার কাছে বহু জাতিকে তাদের স্বাধীনতা হারাতে হল। আমেরিকার 'রেড ইণ্ডিয়ান' ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীরা এখন প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের নিয়ে ঘৃণ্য দাস ব্যাবসায় গড়ে ওঠে। উপনিবেশগুলিতে তাদের অধিবাসীদের ওপর অত্যাচার করে, শিল্প-বাণিজ্য ধ্বংস করে, নির্লজ্জ শোষণ চালিয়ে ইউরোপীয়রা ধনী হয়ে উঠতে থাকে। এ ব্যাপারে বিশেষতঃ দুজন স্পেনীয় সৈন্যাধ্যক্ষের কু-কীর্তির কথা উল্লেখ করতে হয়। ম্যাগেলানের সমুদ্রযাত্রার বছরেই (১৫১৯ খ্রীঃ) নৌ অভিযাত্রীদলের নায়ক কর্টেজ মেক্সিকো শহরে ঢুকে স্পেনের রাজার জন্য জয় করেন 'আজটেক' সাম্রাজ্য। তার এগারো বছর পরে আর একজন, নৌ-অভিযাত্রী দলের আর এক নায়ক— পিজারো 'ইনকা' সাম্রাজ্য (বর্তমানে যেখানে পেরু) জয় করেন। চরম বিশ্বাসঘাতকতা আর নিষ্ঠুরতার সঙ্গে উভয়ে ঐ দুই প্রাচীন সভ্যতাকে ধ্বংস করেন। এদের বিশাল সোনা-রূপোর ভাণ্ডার নিঃশেষ করে সমৃদ্ধ হয় স্পেন।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলে ইউরোপে বিভিন্ন জাতিগুলি সংগঠিত হয় এবং শক্তিশালী হয়। মধ্যযুগে ভূমধ্যসাগরীয় ব্যবসা-বাণিজ্যে অগ্রণী ইটালী-জার্মানির নগর-রাষ্ট্রগুলি সামুদ্রিক অভিযানের পৃষ্ঠপোষকতা করে নি। এগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল কতকগুলি উঠতি জাতীয় রাষ্ট্র—স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং হল্যাণ্ড। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্য করে এরাই ধনী হয়ে ওঠে। স্বার্থ-সচেতন এই জাতীয় রাষ্ট্রগুলি প্রত্যেকেই পৃথিবী-জোড়া এই বাণিজ্যে একচেটে অধিকার স্থাপনে উদগ্র হয়ে ওঠে।

——

চতুর্থ অধ্যায়

● চার্চে ভাঙন—ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়া

নবজাগরণ আন্দোলন ইটালী থেকে আল্পস্ পর্বত অতিক্রম করে ক্রমে উত্তরদিকে বিস্তৃত হতে থাকে। অবশেষে ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে নবজাগরণের যুক্তিবাদের প্রভাবে ধর্মীয় তত্ত্ব ও আচার-অনুষ্ঠানের তীব্র সমালোচনা শুরু হয়। পোপের কর্তৃত্ব এবং ধর্মযাজকদের অনাচারের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ ওঠে। ফলে সামন্ততন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ ক্যাথলিক চার্চের ঐক্য ভেঙে যায়। এই আন্দোলন 'রিফরমেশন' বা ধর্মসংস্কার আন্দোলন নামে খ্যাত।

॥ ধর্মসংস্কারের কারণ ॥ দীর্ঘকালের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ ছিল ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূলে। যীশুখ্রীষ্ট নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন যে, ধর্মযাজকরা পবিত্র, সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করবে। কিন্তু যাজকরা হয়ে পড়েছিলেন বিলাসী ও দুর্নীতিপরায়ণ। তাঁদের ভোগলালসা বেড়ে গিয়েছিল, অনাচার-কদাচারে লিপ্ত হতেও তাঁদের বিবেকে বাধত না। ধর্মভীরুতার সুযোগ নিয়ে অজ্ঞ মানুষের কাছ থেকে তাঁরা নানা ফন্দিতে অর্থ সংগ্রহ করতেন। উদাহরণ হিসাবে, খ্রীষ্ট সমাজের প্রধান ধর্মগুরু পোপ বলতেন যে, তাঁর কাছ থেকে **'ইনডালজেন্স'** বা মুক্তিপত্র কিনলেই মানুষের পাপমুক্তি ঘটবে। ধর্মান্ধ মানুষ তাই মুক্তিপত্র কিনত, আর এভাবে পোপের কোষাগার ভরিয়ে তুলত। এ ছাড়া ধর্মযাজকরা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য ভুলে নিজেদের কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য ক্রমশঃ রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে থাকেন। ফলে নিষ্ঠাবান খ্রীষ্টানরা ধর্মযাজকদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা-ভক্তি হারিয়ে ফেলেন।

এছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মানুষ জাতিগর্বে রোমের পোপের কর্তৃত্বকে বিদেশীর কর্তৃত্ব হিসেবে গণ্য করত। তারা পোপের কোষাগারে যে বিপুল অর্থ পাঠাতে বাধ্য হত তা তাদের দৃষ্টিতে ছিল জাতীয় অপচয়।

॥ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকা ॥ ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন **মার্টিন লুথার**। কিন্তু এর অনেক আগেই চার্চের অনাচার ও পোপের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে ইংল্যাণ্ডের জন ওয়াইক্লিফ (১৩২০-১৩৮৪ খ্রীঃ) এবং বোহেমিয়ার জন হাস্ (১৩৭১-১৪১৫ খ্রীঃ)-এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তাঁরা ষোড়শ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করে গিয়েছিলেন বলা যায়।

জন ওয়াইক্লিফ ছিলেন ধর্মযাজক ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। তিনি বলতেন যে, পোপ এই পৃথিবীতে আদৌ ঈশ্বরের প্রতিনিধি নন। দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মযাজকরা হল 'নরকের শয়তান' এবং এরা খ্রীষ্টীয় আচার-অনুষ্ঠান করলে কোন ফল হয় না। তিনি পোপকে বশ্যতাসূচক অর্থদানের বিরোধিতা করেন। তিনি আরও বলতেন, ঈশ্বরের সেবার বিনিময়ে ধর্মযাজকরা ঈশ্বরের কাছ থেকে ভূসম্পত্তি পেয়েছেন। কিন্তু ক্যাথলিক চার্চে ধর্ম ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে চার্চের ভূ-সম্পত্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। সুতরাং তা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে হবে। এর ফলে গরীবদের ওপর চাপানো করের বোঝা হাল্কা হবে। তিনি উপদেশ দিতেন সকলকে বাইবেল পড়তে—কোন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান বাইবেল-বহির্ভূত হলে তা বর্জন করতে হবে। সকলে যাতে বাইবেল পড়তে পারে সেজন্য তিনিই সর্বপ্রথম ইংরেজী ভাষায় বাইবেল অনূদিত করিয়েছিলেন।

জন ওয়াইক্লিফ ধর্মের যে আদর্শ প্রচার করেন তা হল ঃ ঈশ্বরকে লাভ করার জন্য ধর্মযাজকদের মধ্যস্থতার দরকার নেই, প্রতিটি মানুষ হবে নিজেই তার পুরোহিত এবং ঈশ্বর ও মানবপুত্র যীশুর প্রতি ভক্তিতে সে থাকবে অটল। এই মতই পরবর্তীকালে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মূলনীতি হয়ে দাঁড়ায়। তাই তাঁকে বলা হয় 'ধর্ম সংস্কারের উষা তারকা।'

জনগণের মধ্যে ওয়াইক্লিফের আদর্শ প্রচারের জন্য একদল পুরোহিত শিক্ষালাভ করেন। এঁদের বলা হল **লোলার্ড**। এমন

ব্যক্তি-যে পোপের বিষনজরে পড়বেন ও নিন্দিত হবেন তাতে আর আশ্চর্য কি!

এবার আসা যাক জন হাস্-এর কথায়। তিনি ছিলেন একজন ধর্মযাজক ও প্রাগ্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তিনি ওয়াইক্লিফের ভাবশিষ্য ছিলেন এবং বোহেমিয়ার ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি প্রাগের বেহেলহেম গির্জার ধর্মযাজক ও প্রচারকদের অনাচারগুলি বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করেন। প্রধানতঃ ওয়াইক্লিফের মতবাদ তিনি প্রচার করেন। তিনি পোপের কর্তৃত্ব অস্বীকার ও ধর্মযাকজদের দুর্নীতির সমালোচনা করেন এবং চার্চের সংস্কারের দাবি করেন। ১৪১২ খ্রীষ্টাব্দে বোহেমিয়ায় একদল মুক্তিপত্র বিক্রেতা এলে হাস্ তার প্রবল প্রতিবাদ করেন এবং মুক্তিপত্রের পুরো তত্ত্বটি অস্বীকার করেন। ফলে পোপ তাঁকে খ্রীষ্টসজ্ঘ থেকে বহিষ্কার করেন।

এদিকে কন্সটান্সের কাউন্সিল বা ধর্মীয় পরিষদ ক্যাথলিক ধর্মকে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। এই কাউন্সিল হাসকে তাঁর মতবাদ পরিত্যাগ করে চর্চের প্রতি আনুগত্য দেখাতে আদেশ করে। হাস্ বলেন যে, তাঁর মতবাদ বাইবেলের নজিরে ভুল প্রমাণিত হলে তা করতে তিনি রাজী আছেন। অবশেষে তাঁকে পুড়িয়ে মারা হয়। তাঁর এই শহীদের মৃত্যু বোহেমিয়ায় সংস্কার অন্দোলনকে তীব্র করে তোলে। বিশেষতঃ দক্ষিণাঞ্চলে গণঅভ্যুত্থান ঘটে। প্রায় আঠারো বছর (১৪১৯-১৪৩৭ খ্রীঃ) পবিত্র রোমান সম্রাটের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে বিদ্রোহীদের তুমুল যুদ্ধ হয় এবং কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা জয়লাভও করে। অবশেষে বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে যায়। তবু হাস্-র অনুগামীদের এই যুদ্ধ পোপ ও ক্যথলিক চার্চের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল এবং এদ্বারা চেক জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে।

॥ মার্টিন লুথার ও জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূচনা ॥

মার্টিন লুথারের (১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রীঃ) নেতৃত্বে জার্মানিতে শুরু হয় ধর্মসংস্কার আন্দোলন। মার্টিন লুথার ছিলেন উইটেনবার্গ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক। একবার রোমে গিয়ে স্বচক্ষে

তিনি পোপের দরবারের জাঁকজমক ও অনাচার দেখে মর্মাহত হন এবং প্রচলিত ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের প্রতি সন্দেহ দেখা দেয় তাঁর মনে। এই সময় ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে পোপের প্রতিনিধি **টেটজেল** 'মুক্তিপত্র' বিক্রি করতে আসেন জার্মানিতে। এই 'মুক্তিপত্র' বিক্রয়ের বিরুদ্ধে তিনি গর্জে ওঠেন। দু'বছর পরে শুধু মুক্তিপত্রের নয়, আর কয়েকটি প্রথার বিরুদ্ধে তিনি পঁচানব্বুইটি প্রবন্ধ লিখে উইটেনবার্গের গির্জার দরজায় ঝুলিয়ে দেন। এর ফলে প্রবল আলোড়ন শুরু হয়। পোপ তাঁকে খ্রীষ্টীয় সঙ্ঘ থেকে বহিষ্কারের আদেশ দেন।

কিন্তু কয়েকজন জার্মান শাসক লুথারকে সমর্থন করেন। তাই লুথার পোপের আদেশপত্র জনসমক্ষে পুড়িয়ে ফেলেন।

ধর্মদ্রোহিতার অপরাধে জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের সম্মুখে লুথারের বিচার শুরু হয়। লুথার বললেন—বাইবেলের নজিরে যদি তাঁর মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয় কেবলমাত্র তখনই তিনি তা পরিবর্তন করবেন। সম্রাটের আদেশে তখন লুথার ও তাঁর অনুগামীদের ধর্মসঙ্ঘ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়। লুথার সাক্সনিতে আত্মগোপন করে থাকলেন। ঐ সময়ে তিনি জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন। অবশেষে ১৫৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন।

॥ ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল ॥ লুথারবাদ বা 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' মতবাদের (প্রচলিত খ্রীষ্টীয় ধর্মমতবাদের 'প্রটেস্ট' বা প্রতিবাদ করা হয়েছিল বলেই এই নামকরণ) প্রসার ঘটতে থাকে। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে, জার্মানির উত্তরাঞ্চল 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' মতবাদ গ্রহণ করেছিল কিন্তু দক্ষিণাঞ্চল 'ক্যাথলিক' মতবাদে অটল থাকে। 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' মতবাদ ক্রমে সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে ছড়িয়ে পড়ে।

ইংল্যাণ্ডেও ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার করে। ইংল্যাণ্ডের টিউডর বংশীয় রাজা **অষ্টম হেনরী** (১৫০৯-১৫৪৭ খ্রীঃ) যদিও গোঁড়া ক্যাথলিক ছিলেন কিন্তু একটি ব্যক্তিগত কারণে তিনি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। কারণটি হচ্ছে তিনি তাঁর স্ত্রী

ক্যাথারিনের (যিনি আবার তাঁরই বিধবা বৌদি) সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে অ্যানি বোলিন নামে এক সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পোপ এই বিবাহ-বিচ্ছেদ মঞ্জুর করতে টালবাহানা করায় অষ্টম হেনরী তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ইংল্যাণ্ডের জনগণ অবশ্য বিদেশী পোপকে প্রচুর অর্থ পাঠাতে হত বলে এবং চার্চের দুর্নীতির জন্য—হেনরীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে থাকে।

জুইঙ্‌লি ও ক্যালভিনের নেতৃত্বে সুইজারল্যাণ্ডে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। কালক্রমে ফ্রান্স ও হল্যাণ্ডে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' মতবাদ বিস্তৃত হয়। জন নক্সের নেতৃত্বে স্কটল্যাণ্ডেও 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' চার্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। মনে রাখতে হবে যে, এইসব মতবাদ 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' হলেও এদের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে পার্থক্য ছিল।

এইভাবে 'রোমান ক্যাথলিক' চার্চের প্রভাব হ্রাস পায়। সেইজন্য হারানো গৌরব ফিরিয়ে আনতে 'ক্যাথলিক' মতবাদের ধ্বজাধারীরা ক্যাথলিক চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার কাজে মন দেয়।

॥ **ক্যাথলিক চার্চের সংস্কার প্রচেষ্টা** ॥ 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' ধর্মের ব্যাপক প্রসার বন্ধ করার জন্য 'ক্যাথলিক' ধর্মাবলম্বীরা যে আন্দোলন শুরু করেন তার নাম 'কাউন্টার রিফরমেশন' বা প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলন। তাঁরা ভিতর থেকে ক্যাথলিক চার্চের দোষত্রুটি দূর করতে চাইলেন। তাঁদের এই প্রতিরোধী ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন তিনটি ধারায় প্রকাশিত হয়, (ক) ধর্মযাজকদের নৈতিক মান উন্নয়নের চেষ্টা, (খ) ধর্মদ্রোহিতা নির্মূল করার জন্য 'যীশুর সমাজ' ও 'ইনকুইজিশন' বা ধর্মীয় বিচার সভার পত্তন, (গ) ট্রেণ্টের কাউন্সিল বা ধর্ম সংসদ।

[ক] **ধর্মযাজকদের নৈতিক মান উন্নয়ন**ঃ ষোড়শ শতাব্দীতে প্রটেস্ট্যাণ্ট মতবাদ—'লুথারবাদ', 'জুইঙ্‌লিবাদ', 'ক্যালভিনবাদ' ইত্যাদিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই সুযোগে ক্যাথলিক-পন্থীরা প্রচার করতে লাগল যে, ধর্মসংস্কার আন্দোলন সংস্কারের নামে ধর্মকেই ধ্বংস করছে। সুতরাং প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলনে

জোয়ার আসে। এ ছাড়া, ঐ সময় শিক্ষিত ও সংস্কারপন্থী পোপদের আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের উচ্চ নীতিবোধও ছিল। পোপ তৃতীয় পল ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের এক উচ্চ নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত করেন।

[খ] **'যীশুর সমাজ' ও 'ইন্‌কুইজিশন'ঃ** ধর্মদ্রোহিতা যাতে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যায় সে-কারণে 'জেস্যুইট' সম্প্রদায়ের অবদান উল্লেখ করার মত। এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মক আহত এক স্পেনীয় সৈনিক। তাঁর নাম ইগ্‌নেশিয়াস লায়োলা। তিনি তাঁর ধর্মীয় সমিতির নাম দেন 'যীশুর ধর্মসমাজ' আর এর সদস্যরা পরিচিত হয় 'জেস্যুইট' নামে। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল রোমান চার্চ ও পোপের সেবার জন্য একদল উৎসর্গীকৃত মানুষ তৈরি করা। এই প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা ও উর্ধ্বতন যাজকদের প্রতি আনুগত্য কঠোরভাবে বজায় রাখা হত। নিষ্কলুষ জীবন-যাপন করে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম প্রচার করে যেতেন জেস্যুইটরা। ধর্মের সেবার জন্য তাঁরা রাজনীতি বা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিতে, এমন কি ষড়যন্ত্র করতেও পিছপা হতেন না। তাঁদেরই প্রচারের ফলে জার্মানির কয়েকটি জায়গায় 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' ধর্মের পরিবর্তে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃ প্রবর্তিত হয়। এমনকি এঁদেরই চেষ্টায় ফ্রান্স, স্পেন, পোল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ও ইংল্যাণ্ডে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' ধর্ম প্রায় উচ্ছেদ হতে বসেছিল। সুদূর চীন, ভারতবর্ষ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এঁরা এসেছিলেন। ইউরোপে এঁদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়গুলি ছিল সবার সেরা।

ধর্মদ্রোহীদের শাস্তি দেবার জন্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'ইনকুইজিশন' নামে এক বিচার সংগঠন। এই সংগঠনের সদস্যরা যে-কোন ক্যাথলিক দেশে যেতে পারত। ধর্মদ্রোহীদের ওপর যে-কোন উৎপীড়ন বা তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকার তাদের ছিল। ক্রমশঃ এই সংগঠনের শাস্তির কঠোরতার মাত্রা ছাড়িয়া যায়। ধর্মদ্রোহী বলে বহু মানুষকে প্রকাশ্য স্থানে পুড়িয়ে মারা হত। এই সংগঠনের কেন্দ্র ছিল স্পেন, ইটালী ও ইংল্যাণ্ড।

[গ] ট্রেন্টের কাউন্সিল বা ধর্ম সংসদ ঃ পবিত্র রোমান সম্রাট পঞ্চম চার্লস 'রোমান ক্যাথলিক' ও 'প্রটেস্ট্যান্টদের' মধ্যে বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কাউন্সিল বা ধর্মসংসদ আহ্বানের কথা বলেছিলেন। অবশেষে পোপ এই ধর্ম সংসদ আহ্বান করেন জার্মানির ট্রেন্ট নামে এক শহরে। এই অধিবেশন চলেছিল প্রায় আঠারো বছর (১৫৪৫-১৫৬৩ খ্রীঃ), অবশ্য যুদ্ধ ও প্লেগের জন্য মাঝে মাঝে তা বন্ধ থাকত। 'প্রটেস্ট্যান্ট'দের সঙ্গে কোন আপস-মীমাংসা করা সম্ভব হয় নি। তবে ক্যাথলিক চার্চের অনেক গলদ দূর করা হয়েছিল এবং ধর্মযাজকদের নৈতিক মান উন্নয়নে এই ধর্ম সংসদের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। একই ব্যক্তির একাধিক বৃত্তি লাভ চার্চের উচ্চপদের ক্রয়বিক্রয়, পুরোহিতদের বিবাহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ হয়। পোপের স্থান ধর্মসংসদের উর্ধ্বে বলে গণ্য হয়, তিনি 'চার্চের এক এবং অদ্বিতীয় কর্তা' বলে ঘোষিত হন।

এইভাবে কিছুটা আভ্যন্তরীণ সংস্কার আন্দোলন, আর 'প্রসেস্ট্যান্টরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হওয়ার ফলে রোমান ক্যাথলিক ধর্মের দুর্নীতি অনেক কমে যায়। ক্যাথলিক চার্চ তার পুরনো গৌরব ও কর্তৃত্ব ফিরে পায়।

॥ পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ ॥ ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে 'প্রটেস্ট্যান্ট' ধর্মসংস্কার আন্দোলন বনাম 'ক্যাথলিক'দের প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দ্বন্দ্ব জার্মানি বা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে দেখা দেয়। এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল প্রায় নয় বৎসর (১৫৪৬-১৫৫৫ খ্রীঃ)। অবশ্য এই গৃহযুদ্ধের পেছনে শুধু ধর্মীয় নয়, রাজনৈতিক কারণও ছিল। ঐ সময় পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বংশীয় পঞ্চম চার্লস্‌। তিনি তাঁর পিতা ও পিতামহের বিবাহের সূত্র ধরে এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে বসেন। তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল—অস্ট্রিয়া, জার্মানি, স্পেন, নেপ্‌লস্‌ ও সিসিলি, নেদারল্যাণ্ডস্‌ ও স্পেনীয় আমেরিকা। প্রায় অর্ধ-ইউরোপের অধীশ্বর পঞ্চম চার্লস্‌ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। তাই তিনি পোপের পক্ষ অবলম্বন করে 'প্রটেস্ট্যান্ট' আন্দোলনকে চূর্ণ করতে চাইলেন। আবার তাঁর

আশঙ্কা ছিল ধর্মীয় বিভেদ বেড়ে গেলে রাজনৈতিক বিভেদ দেখা দেবে আর পবিত্র রোমান সম্রাট হিসেবে তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখা দুরূহ হয়ে উঠবে। অন্যদিকে ছোটখাটো জার্মান রাজারা অনেকেই 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' আন্দোলনের পক্ষে যোগ দেন। ফলে গোটা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে শুরু হল গৃহযুদ্ধ—একদিকে 'রোমান ক্যাথলিক', অন্যদিকে লুথার-অনুগামী 'প্রটেস্ট্যাণ্ট।'

পঞ্চম চার্লস যদি পুরোপুরিভাবে তাঁর শক্তি-সামর্থ্য লুথারের ধর্ম আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করতে পারতেন, তাহলে তা চূর্ণ হয়ে যেত। কিন্তু ফ্রান্স ও তুরস্কের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হচ্ছিল। এরই ফাঁকে ফাঁকে তিনি 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' আন্দোলন দমন করার কাজ করছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ব্যর্থ হন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অগস্‌বার্গের সন্ধিতে এই গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। এতে "রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম"—এই নীতি গৃহীত হয় অর্থাৎ প্রজাদের ধর্ম নির্ধারণের ভার দেওয়া হয় রাজার হাতে। এর ফলে ইউরোপে কিছু রাষ্ট্র থাকবে 'ক্যাথলিক' আর কিছু 'প্রটেস্ট্যাণ্ট', কিন্তু প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে ধর্মীয় সহনশীলতার কথা বলা হয় নি। এ ছাড়া, বিভিন্ন 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' মতবাদের মধ্যে কেবলমাত্র লুথারবাদই স্বীকৃত হয়েছিল। ধর্মীয় নানান সমস্যা অমীমাংসিত থেকে গেল—প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব প্রবল আকার ধারণ করে।

॥ দ্বিতীয় ফিলিপ ও প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলন ॥ পঞ্চম চার্লস স্বেচ্ছায় তাঁর ছেলে ফিলিপের অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করেন। পঞ্চম চার্লসের মতই দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। এই পৃথিবীতে ঈশ্বর তাঁকে ক্যাথলিক ধর্মের রক্ষক নিযুক্ত করেছেন বলে তিনি মনে করতেন। স্বভাবতঃই তাঁর রাজত্বকালে (১৫৫৬-১৫৯৮ খ্রীঃ) প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে তাঁর রাজত্বকাল দুটি ঘটনার জন্য বিখ্যাত হয়ে আছে, (১) নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ এবং (২) ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে **আর্মাডা'** প্রেরণ।

[এক] **নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহ ঃ** নেদারল্যাণ্ডস্ ('নেদার, অর্থ

নিম্ন 'ল্যাণ্ড' অর্থ ভূমি অর্থ সমুদ্রপৃষ্ঠের নীচে অবস্থিত বলে এই নামকরণ) বলতে হল্যাণ্ড ('হলো' বা ফাঁপা ভূমি, উত্তর সাগর থেকে দেশটিকে রক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছে বিরাট বাঁধ ও দেয়াল) আর বেলজিয়ামকে বোঝায়। সর্বমোট সতেরটি রাজ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল নেদারল্যাণ্ডস্—উত্তরের সাতটি রাজ্য শাসন ব্যাপারে ছিল গণতান্ত্রিক· শিল্প-বাণিজ্যে অগ্রগামী এবং ধর্মে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট'; অপরপক্ষে দক্ষিণের দশটি রাজ্য ছিল অভিজাততান্ত্রিক এবং ধর্মে 'ক্যাথলিক'। সামগ্রিকভাবে নেদারল্যাণ্ডের অধিবাসীরা সমুদ্রচারী ও কষ্টসহিষ্ণু। মধ্যযুগে তারা ব্যবসাবাণিজ্য করে দেশটিকে সমৃদ্ধ করে তোলে; সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে দেশটি খুব উন্নত হয়ে ওঠে। তারা স্বাধীনতাপ্রিয় হলেও স্পেনের আধিপত্য মোটামুটি মেনে নিয়েছিল। স্পেনের আয়ের একটা বড় অংশ তারাই যোগাত। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশটি দ্বিতীয় ফিলিপের বিষনজরে পড়ে এজন্য যে এর উত্তরাঞ্চলে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' ধর্ম খুব বিস্তৃতি লাভ করেছিল। দ্বিতীয় ফিলিপ সেখানে তাঁর রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন।

এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ফিলিপ সেনাপতি আলভার ডিউকের নেতৃত্বে একটি অভিযান পাঠালেন নেদারল্যাণ্ডে। পৈশাচিক নির্মমতায় আলভার-এর জুড়ি ছিল না। তিনি সেখানে প্রতিষ্ঠিত করলেন 'আপৎকালীন সংসদ' নামে এক বিচার সভা। বিচারের নামে হাজার হাজার ধর্মদ্রোহী বা 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' খ্রীষ্টানকে হয় ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়ে, নয় আগুনে পুড়িয়ে মারা হল। দু'বছরের মধ্যে নেদারল্যাণ্ডে এল শ্মশানের শান্তি। এরপর টাকার প্রয়োজনে আলভা নেদারল্যাণ্ডবাসীর ওপর গুরুভার করের বোঝা চাপিয়ে দিলেন। এ বোঝা বইতে গেলে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যই যেত বন্ধ হয়ে। তাই এর বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়াল।

নেদারল্যাণ্ডবাসীদের নেতৃত্ব দিলেন অরেঞ্জের প্রিন্স উইলিয়ম নামে এক মহাজ্ঞানী। 'মৌন উইলিয়ম' নামেই ইনি সমধিক পরিচিত। যুদ্ধক্ষেত্রে উভয়পক্ষই চরম নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছিল। স্পেন কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েও নেদারল্যাণ্ডবাসীরা আশ্চর্য ত্যাগ ও

বীরত্ব দেখিয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে লেডেন অবরোধের কথা উল্লেখ করা যায়। অবরুদ্ধ লেডেনবাসীরা দিনের পর দিন অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেও স্পেনীয়দের বিরোধিতা করেছিল। অবশেষে নিজেরাই বাঁধ ভেঙে দিয়ে শহরটিকে জলমগ্ন করে দেয়। সমুদ্রের এই জল দেখে স্পেনীয়য়া ভয়ে পালিয়ে যায়। এ ব্যাপারে প্রিন্স উইলিয়মের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। আবার তিনিই উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করে (১৫৭৬ খ্রীঃ) স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাকেন। অবশ্য এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। বাধ্য হয়ে তিনি উত্তরের সাতটি প্রটেস্ট্যাণ্ট রাজ্য নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করেন। অবশেষে ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দ উইলিয়মের নেতৃত্বে হল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম উত্তরাঞ্চলে হল্যাণ্ডেই বেশি চলেছিল, নেদারল্যাণ্ডের ক্যাথলিক-প্রধান দক্ষিণাঞ্চলে নয়। স্পেন দক্ষিণের বহু অভিজাতকে ঘুষ দিয়ে বশে আনে এবং নেদারল্যাণ্ডের অংশবিশেষ, যা বর্তমান বেলজিয়াম, পুনরায় দখল করে নেয়। স্পেন হল্যাণ্ডের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করল না। হল্যাণ্ডবাসীরা উইলিয়মকে রাজমুকুট পরাতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। সেখানে ঘোষিত হল প্রজাতন্ত্র। কিন্তু উইলিয়মকে পরাজিত করতে না পেরে দ্বিতীয় ফিলিপ গুপ্তঘাতক দিয়ে তাঁকে হত্যা করালেন (১৫৮৪ খ্রীঃ)। হল্যাণ্ডবাসীরা বিপদে পড়লেন। মৃত্যুর পূর্বেই উইলিয়ম ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের কাছে সাহায্যের আবেদন করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য তারা সামান্য সাহায্য লাভ করেছিল ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে। সে যাই হোক, দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁর জীবদ্দশায় নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করেন নি।

অবশেষে স্পেনীয়রা নেদারল্যাণ্ডবাসীদের কাছে পরাজিত হয় এবং নেদারল্যাণ্ডের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় (১৬০৯ খ্রীঃ)। এর পরেও তা বানচাল করার জন্য আবার স্পেনীয়রা যুদ্ধ করেছিল কিন্তু স্পেন তখন একটি দুর্বল রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল আর নেদারল্যাণ্ডের শক্তি তখন ক্রমবর্ধমান।

দীর্ঘকাল পরে তৃতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফ্যালিয়ার সন্ধিতে হল্যাণ্ডের প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়। অবশ্য দক্ষিণ নেদারল্যাণ্ডস্ (পরবর্তীকালে 'অস্ট্রীয় নেদারল্যাণ্ডস্' নামে খ্যাত) হল্যাণ্ড থেকে পৃথক হয়ে বেলজিয়াম রাজ্য নামে ক্যাথলিক রাষ্ট্র হিসেবে স্পেনের অধিকারভুক্ত রয়ে যায়।

[দুই) **'আর্মাডা'র কথা ঃ** প্রতিরোধী ধর্মসংস্কার আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, 'প্রটেস্ট্যান্ট' ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্পেনের নৌ-অভিযান প্রেরণ। এটি প্রেরণ করেন দ্বিতীয় ফিলিপ। তিনি এই নৌবহরের জয় সম্বন্ধে নিশ্চিত ছিলেন বলেই এর নামকরণ করেছিলেন **'অপরাজেয় আর্মাডা'**।

ইংল্যাণ্ড ছিল 'প্রটেস্ট্যান্ট' দেশ। পবিত্র রোমান সম্রাট ও স্পেনরাজ দ্বিতীয় ফিলিপ ছিলেন ক্যাথলিক ধর্মের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক—একথা তোমাদের জানা। তিনি বিয়ে করেছিলেন অষ্টম হেনরীর কন্যা ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বিনী মেরীকে। সুতরাং মেরীর রাজত্বকালে (১৫৫৩-১৫৫৮ খ্রীঃ) তিনি ইংল্যাণ্ডে কাথলিক ধর্ম পুনঃ প্রবর্তিত করেন। কিন্তু মেরীর মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেন 'প্রটেস্ট্যান্ট' এলিজাবেথ (১৫৫৮ খ্রীঃ)। দ্বিতীয় ফিলিপ ভেবেছিলেন তিনি এলিজাবেথকে বিয়ে করে ইংল্যাণ্ডে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের সুযোগ পাবেন। কিন্তু এলিজাবেথ কৌশলে এই বিয়ে এড়িয়ে যেতে থাকলেন। এতে ফিলিপ খুব ক্রুদ্ধ হলেন। এছাড়া, তাঁর রাগের আরও কারণ ছিল। তাঁর বিরুদ্ধে নেদারল্যাণ্ডের বিদ্রোহে এলিজাবেথ বিদ্রোহীদের গোপনে সাহায্য ও উৎসাহ দান করতেন আর সমুদ্রবক্ষে বহু ইংরেজ নাবিক স্পেনীয় বাণিজ্য-জাহাজ আক্রমণ ও লুঠতরাজ করত। অন্যদিকে পোপও ধর্মীয় কারণে এলিজাবেথকে বিষদৃষ্টিতে দেখতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে এলিজাবেথের বৈধ অধিকার নেই—সে অধিকার আছে স্কটদের রানী মেরীর

(যিনি ক্যাথলিক ছিলেন)। ফিলিপ, পোপ, এবং ইংল্যাণ্ডে অবস্থানকারী 'জেসুইট' ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় ইংল্যাণ্ডের ক্যাথলিকরা এলিজাবেথকে হত্যা করে স্কটদের রানী মেরীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানোর ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় এলিজাবেথ মেরীকে প্রাণদণ্ড দেন।

এই সমস্ত ঘটনায় ফিলিপের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। ধর্মদ্রোহী ইংল্যাণ্ডকে নিজ নিয়ন্ত্রণে এনে ক্যাথলিক ধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের জন্য তিনি ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। ১৫৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ১৩০টি যুদ্ধজাহাজের এক বিশাল নৌবহর 'আর্মাডা' পাঠালেন এলিজাবেথের বিরুদ্ধে। এই নৌবাহিনীর প্রধান ছিলেন মেডিনা সাইডোনিয়া নামে নৌযুদ্ধের অভিজ্ঞতাহীন এক ভদ্রলোক।

দেশের এই বিপদের দিনে ইংরেজরা জাতিধর্ম-নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ হল। ড্রেক, হকিন্স, ফ্রবিসার, হাওয়ার্ড ইত্যাদি দুর্ধর্ষ নাবিকরা অপূর্ব কৌশলে ও বীরত্বে মাত্র কয়েকটা ছোট যুদ্ধ-জাহাজ নিয়ে আগুন ধরিয়ে দিল স্পেনীয় যুদ্ধজাহাজগুলিতে। এর ওপর ঝড়েও আর্মাডার বেশ কয়েকটি জাহাজ বিধ্বস্ত হয়ে গেল। এইভাবে 'অপরাজেয় আর্মাডা'র বিপর্যয় ঘটল। ইংল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের চার্চকে নিজ নিয়ন্ত্রণে এনে সেখানে ক্যাথলিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দ্বিতীয় ফিলিপ দেখেছিলেন তা অপূর্ণ থেকে গেল।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল রাজার সঙ্গে প্রজাদের প্রতিনিধি পরিষদ পার্লামেন্টের বিরোধ। মধ্যে এগার বছরের বিরতি দিয়ে (১৬০৩-১৬৮৮ খ্রীঃ) প্রায় চুয়াত্তর বছর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে ছিল স্টুয়ার্ট বংশ। স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা প্রথম জেমসের রাজত্বকালেই (১৬০৩-১৬২৫ খ্রীঃ) রাজায়-প্রজায় এই দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে ওঠে।

॥ রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের কারণ ॥ প্রথম জেমস্ ছিলেন স্কটল্যাণ্ডেরও রাজা। তিনি ইংল্যাণ্ডেরও রাজা হলেন। কিন্তু রাজা হয়েই একাধিক কারণে তাঁর সঙ্গে পার্লামেন্টের বিরোধ বেধে গেল। জেমস্ ছিলেন দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী। তিনি ঘোষণা করেন যে, যেহেতু তিনি ঈশ্বরের প্রতিনিধি, তাঁর ক্ষমতার কোন সীমা নেই। পার্লামেন্ট ও তার অধিকারগুলি তাঁর করুণার ওপর নির্ভরশীল। ঈশ্বরের কাজের সমালোচনা করা পাপ, তেমনি রাজার কাজকে সমর্থন না করা ঘোরতর রাজদ্রোহিতা। পার্লামেন্ট কিন্তু তাঁর এই দাবি মানতে প্রস্তুত ছিল না।

জেমস্ পার্লামেন্টকে উপেক্ষা করে প্রজাদের ওপর নানা কর ধার্য করতে শুরু করলেন। ক্রমেই পার্লামেন্টের অসন্তোষ বাড়তে থাকল। এই বিরোধের মূলে ধর্মীয় কারণও ছিল। প্রথম জেমস্ ছিলেন ক্যাথলিক। কিন্তু এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের জনগণের অধিকাংশই ছিল 'পিউরিট্যান' বা গোঁড়া প্রটেস্ট্যাণ্ট। ধর্মগত এই বিরোধ আবার পররাষ্ট্রনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করেছিল। ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্টদের মধ্যে ত্রিশবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (১৬১৮-৪৮ খ্রীঃ) শুরু হলে প্রটেস্ট্যাণ্ট-প্রধান ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্ট স্বাভাবিকভাবেই প্রটেস্ট্যাণ্ট রাষ্ট্রগুলিকে সাহায্য দেওয়ার পক্ষপাতী ছিল। কিন্তু প্রথম জেমস্ ক্যাথলিক রাষ্ট্র স্পেনের সঙ্গে মিতালীর পক্ষে ছিলেন। এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে জেমসের সঙ্গে পার্লামেন্টের বনিবনা হচ্ছিল না।

প্রথম চার্লস: প্রথম জেম্‌সের পরবর্তী রাজা তাঁর পুত্র প্রথম চার্লসও তাঁর পিতার মতই দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সুতরাং তাঁর রাজত্বকালে (১৬২৫-'৪৯ খ্রীঃ) বিরোধের বিষয়গুলি দূর হয়নি, বরঞ্চ এই বিরোধ দিন দিন তীব্র হতে থাকল। তিনিও পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়াই প্রজাদের ওপর করধার্য করেন। পাঁচজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি 'জবরদস্তিমূলক ঋণ' দিতে অস্বীকার করলে তাঁদের বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করেন। ক্ষুব্ধ পার্লামেণ্ট রাজার কাছে পেশ করল 'পিটিশন অব্ রাইটস্' বা অধিকার বিষয়ক আবেদন। এতে বলা হল, পার্লামেণ্টের অনুমোদন ছাড়া কর ও ঋণ গ্রহণ, বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা, গৃহস্থের বাড়িতে সৈন্য বসান এবং শান্তির সময়ে সামরিক আইন প্রচলন—এ সবই বেআইনী। চার্লস্ আপাততঃ এগুলি মেনে নিলেন, পরে পার্লামেণ্ট ভেঙে দিলেন।

এরপর চার্লস এগারো বছর পার্লামেণ্ট ছাড়াই রাজত্ব করলেন। টাকা যোগাড় করলেন প্রজাদের ওপর ইচ্ছামত কর চাপিয়ে। কিন্তু স্কটল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ বাধায় প্রয়োজন হল প্রচুর টাকার। সুতরাং তাঁকে আবার পার্লামেণ্টের শরণ নিতে হল (১৬৪০ খ্রীঃ)। পার্লামেণ্টের সদস্যরা রাজার অবৈধ আচরণ ও পার্লামেণ্টের সীমাহীন ক্ষমতার উল্লেখ করলে রাজা পার্লামেণ্ট ভেঙে দেন।

॥ লঙ্ পার্লামেণ্ট ও গৃহযুদ্ধ ॥ টাকার প্রয়োজনে প্রথম চার্লস পার্লামেণ্ট ডাকতে আবার বাধ্য হলেন (১৬৪০ খ্রীঃ)। কুড়ি বৎসর এটি স্থায়ী হয়েছিল। তাই লঙ্ পার্লামেণ্ট বলে এটি খ্যাত। রাজাকে অর্থমঞ্জুর না করে এই লঙ্ পার্লামেণ্ট রাজার স্বেচ্ছাচারের দুটি বিচারালয়—'কোর্ট অব্ স্টার চেম্বার' ও 'কোর্ট অব্ হাই কমিশন' বিলুপ্ত করে দিল, রাজার স্বেচ্ছাচারের সাহায্যকারী স্ট্রাফোর্ডের প্রাণদণ্ড দিল। রাজাকে জানিয়ে দিল যে, তাঁকে কমন্স সভার (পার্লামেণ্টের নিম্ন কক্ষ) বিশ্বাসভাজন মন্ত্রী নিয়োগ করতে হবে এবং 'প্রটেস্ট্যাণ্টদের এক সভায়

রাজ্যের ধর্মীয় বিধানের পরিবর্তন করতে হবে। এতে ক্রুদ্ধ রাজা সসৈন্যে পার্লামেণ্টের পাঁচজন নেতাকে বন্দী করতে গেলেন। শুরু হল গৃহযুদ্ধ (১৬৪২ খ্রীঃ)।

এই গৃহযুদ্ধের একদিকে থাকল রাজা এবং তাঁর সমর্থক দল **'ক্যাভালীয়র'** (অশ্বারোহী অর্থাৎ অভিজাত) এবং সৈন্যবাহিনীর অধিকাংশ ; অন্যপক্ষে পার্লামেণ্ট ও তার সমর্থক দল **'রাউণ্ড হেড'** (অর্থাৎ লম্বাচুলহীন, অভিজাত নয়) নামে ধনী বণিক ও লণ্ডন-বাসীরা। এই যুদ্ধ চলল আট বছর (১৬৪২-'৪৯ খ্রীঃ)। অবশেষে পার্লামেণ্টের পক্ষে অলিভার ক্রমওয়েল নামে এক শক্তিশালী নেতার আবির্ভাব হল। পার্লামেণ্ট জয়লাভ করল। চার্লসকে বন্দী করে তাঁর বিচার হল। বিচারে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হল। ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তাঁর শিরশ্ছেদ করা হল।

॥ ক্রমওয়েল ও কমনওয়েলথ্ ॥ প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদের পর অলিভার ক্রমওয়েল ইংল্যাণ্ডে কমনওয়েলথ (প্রজাতন্ত্র) প্রতিষ্ঠিত করেন এবং কমনওয়েলথের অধিনায়ক হিসেবে দেশ শাসন করতে থাকেন। ইংরেজরা তাঁকে অবশ্য রাজমুকুট গ্রহণ করতে অনুরোধ করে, কিন্তু তিনি সসম্মানে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর উপাধি হয় 'লর্ড প্রটেক্টার' বা মহান রক্ষক। তাঁর কঠোর সুশাসনে দেশের শক্তি-বৃদ্ধি হয়, তাঁর নৌবাহিনী ওলন্দাজ, ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবাহিনীকে বিতাড়িত করে। এই প্রথম ইংল্যাণ্ডের নৌ-শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। এসব সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রকে তিনি দৃঢ়মূল করে যেতে পারেন নি। তাঁর মৃত্যুর (১৫৫৮ খ্রীঃ) কিছুদিনের মধ্যেই প্রজাতন্ত্র ভেঙে পড়ে।

॥ স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥ ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ড ক্রমওয়েল কিছুকাল দেশের শাসনভার পান। কিন্তু তিনি ছিলেন অযোগ্য শাসক। সেজন্য তাঁর পদত্যাগের পর পার্লামেণ্টের সম্মতি নিয়ে সৈন্যাধ্যক্ষ মঙ্ক প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে রাজপদ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। চার্লস সিংহাসনে বসলেন

(১৬৬০ খ্রীঃ)—স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটল। চার্লস দক্ষ শাসক ছিলেন না, কিন্তু চতুর ছিলেন। তিনি পার্লামেণ্টের সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে চলতে পেরেছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা দ্বিতীয় জেমস্ সিংহাসনে বসেন (১৬৮৫ খ্রীঃ)।

॥ **দ্বিতীয় জেমস্ : গৌরবময় বিপ্লব** ॥ দ্বিতীয় চার্লসের পর দ্বিতীয় জেমস্ ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলে গোলযোগ দেখা দিল। তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক এবং ইংল্যাণ্ডে পোপের প্রাধান্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী। ফলে 'প্রটেস্ট্যাণ্ট' পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠল। তিনি দাবী করলেন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন আইন উপেক্ষা বা আইনের প্রয়োগ স্থগিত করার ক্ষমতা তাঁর আছে। দেশের ক্যাথলিক-বিরোধী আইন উপেক্ষা করে তিনি সৈন্য বিভাগে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যান্য শিক্ষায়তনে ক্যাথলিকদের উচ্চপদে নিযুক্ত করতে থাকলেন। এমনকি নিজের অনুগত লোক নির্বাচিত করে পার্লামেণ্টকে হাতের পুতুলে পরিণত করার চেষ্টা করলেন। এইভাবে তিনি জনগণের অপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

এই সময়ে অপুত্রক রাজা একটি পুত্র-সন্তান লাভ করলে জনগণের ধৈর্যচ্যুতি ঘটল। কেননা তাদের ভয় হল ইংল্যাণ্ডের এই ভাবী রাজা তাঁর পিতার মতই হবে ক্যাথলিক ও অত্যাচারী। তখন ইংল্যাণ্ডের সাতজন নেতা রাজা জেমস্-এর প্রটেস্ট্যাণ্ট কন্যা মেরী ও জামাতা উইলিয়ম অব্ অরেঞ্জ (হল্যাণ্ডের রাজা)-কে আমন্ত্রণ করলেন ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসার জন্য। তদনুযায়ী উইলিয়ম সসৈন্যে ইংল্যাণ্ডে পৌছুলেন (১৬৮৮ খ্রীঃ)। নিরুপায় জেমস্ বিনা যুদ্ধে ফ্রান্সে পালিয়ে গেলেন ; সুতরাং পার্লামেণ্টের চূড়ান্ত জয় হল। এই পরিবর্তন ঘটল বিনা রক্তপাতে, বিনা গৃহযুদ্ধে। ইতিহাসে তাই একে বলা হয় '**গৌরবময় বিপ্লব**'।

॥ **গৌরবময় বিপ্লবের ফলাফল** ॥ এই গৌরবময় বিপ্লব পার্লামেণ্টের গুরুত্ব বহু পরিমাণে বাড়িয়ে দিয়েছিল। পার্লামেণ্টের সদস্যদের

নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ উইলিয়ম ও মেরীকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে। সুতরাং রাজাদের দৈবস্বত্ব অনুসারে নয়, বংশানুক্রমিক অধিকারেও নয়, পার্লামেণ্টের ইচ্ছানুসারে তাঁরা রাজপদ পেলেন। সহজ কথায়, পার্লামেণ্টেই সর্বময় কর্তা প্রমাণিত হল।

এরপর প্রজাদের কয়েকটি অধিকারও ঘোষিত হয়। এই অধিকার-বিষয়ক প্রস্তাবটি ('বিল অব্ রাইটস্') পার্লামেণ্টে গৃহীত হয়ে আইনে পরিণত হয় (১৬৮৯ খ্রীঃ)। এতে বলা হল, কোন ক্যাথলিক আর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসতে পারবেন না; রাজা কোন আইন উপেক্ষা করতে বা তার প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারবেন না; স্থায়ী বেতনভোগী সৈন্যবাহিনী রাখতে পারবেন না; আরও বলা হল যে, পার্লামেণ্টের সম্মতি ছাড়া করধার্য করতে পারবেন না, বিনা বিচারে কাউকে কারারুদ্ধ করতে পারবেন না।

এছাড়া 'ধর্মসহিষ্ণুতার আইনের' (১৬৮৯ খ্রীঃ) দ্বারা বিদ্রোহী প্রটেস্ট্যাণ্টদের নিজ ধর্ম আচরণের স্বাধীনতা দেওয়া হল, অবশ্য ক্যাথলিকরা এই স্বাধীনতা পায় নি। আবার পার্লামেণ্টই 'নিষ্পত্তির আইন' (১৭০১ খ্রীঃ) দ্বারা সন্তানহীন হওয়ায় উইলিয়মের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী স্থির করল। এইভাবে রাজার স্বৈরাচার নিয়ন্ত্রিত হয় এবং পার্লামেণ্টের অবিসংবাদী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

———

ষষ্ঠ অধ্যায় | মুঘল ভারত

১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের ইতিহাসে একটি নতুন যুগের, নতুন সাম্রাজ্যের সূচনা হয়—মুঘল সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্য টিঁকে ছিল ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তবে অল্পকালের বিরতি দিয়ে প্রায় ১৮০ বছর (১৫২৬-১৭০৭ খ্রীঃ) হল এর গৌরবের কাল।

॥ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ॥ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর। তাঁর ধমনীতে প্রবাহিত ছিল তৈমুরলঙ্ ও চেঙ্গিস খাঁর রক্ত। নিজ রাজ্যচ্যুত (মধ্য এশিয়ার ফরঘনা) ভাগ্যান্বেষী কিশোর বাবর কাবুল অধিকার করেন (১৫৪০ খ্রীঃ)। সেখানে কুড়ি বছর রাজত্ব করার পর ভারতে প্রবেশ করেন। দিল্লীর সুলতানী বংশের অন্তর্বিরোধের সুযোগে তিনি সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে আক্রমণ করেন। পাণিপথের যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবর তাঁকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যুদ্ধবিদ্যা ছিল বাবরের অস্থিমজ্জায় মিশে, আর তাঁর ছিল সেকালে ভারতীয়দের কাছে অজ্ঞাত, যুদ্ধজয়ের অমূল্য উপকরণ—কামান। এরপর মেবারের শক্তিশালী রাণা রাজপুতবীর সংগ্রাম সিংহকেও তিনি খানুয়ার যুদ্ধে (১৫২৭ খ্রীঃ) হারিয়ে দেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিদের যুক্ত প্রতিরোধও তিনি ভেঙে দেন (১৫২৯ খ্রীঃ)। পর বৎসর তিনি মারা যান (১৫৩০ খ্রীঃ)।

বাবর

॥ মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ॥ হুমায়ুন : বাবরের পুত্র হুমায়ুনের রাজত্বকালে (১৫৩০-৪০ খ্রীঃ এবং ১৫৫৫-৫৬ খ্রীঃ) মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেন বিহারের শাসনকর্তা শেরশাহ। তাঁর

কাছে পরাজিত হয়ে (১৫৪০ খ্রীঃ) হুমায়ুন পারস্যে আশ্রয় নেন। ১৫/১৬ বৎসর শেরশাহ ও তাঁর বংশধররা দিল্লীতে রাজত্ব করেন। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন, পরের বছরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

হুমায়ুন

আকবর ঃ আকবরের রাজত্ব-কালেই (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রীঃ) মুঘল সাম্রাজ্য দৃঢ়মূল হয়। হুমায়ুনের মৃত্যুর পরই আফগান শাসক আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী হিমু দিল্লী ও আগ্রা অধিকারের জন্য সচেষ্ট হন। নাবালক আকবরের অভিভাবক বৈরাম খাঁ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫৫৬ খ্রীঃ) হিমুকে পরাজিত ও নিহত করেন। ফলে আফগান-শক্তি নিঃশেষিত হয় এবং মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পথ সুগম হয়। এরপর শুরু হয় আকবরের জয়যাত্রা। গোয়ালিয়র, আজমীর, মালব, গণ্ডোয়ানা তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হল। দূরদর্শী আকবর রাজপুত জাতির সঙ্গে গভীর মৈত্রী গড়ে তোলেন, তাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কেও আবদ্ধ হন। রাজপুতানার অধিকাংশ রাজপুত রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি চিতোর জয় কারন।

আকবর

অবশ্য স্বাধীনতাপ্রিয় রাজপুতবীর মেবারের রাণা প্রতাপ চিতোর

উদ্ধারের জন্য আজীবন আকবরের বিরুদ্ধে লড়েছেন। হলদিঘাটের যুদ্ধে (১৫৭৬ খ্রীঃ) মুঘল সৈন্যের কাছে পরাজিত হয়ে রাজ্যসুখ বিসর্জন দিয়ে প্রতাপ বনেজঙ্গলে কাটিয়েছেন নানান দুর্দশার মধ্যে।

কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, বেলুচিস্থান ও কান্দাহার আকবরের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দাক্ষিণাত্যেও আহম্মদনগর ও খান্দেশের ওপর তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়। শুধুমাত্র রাজ্যবিস্তারেই নয়, সুপরিকল্পিত শাসনব্যবস্থা, উদার ধর্মনীতি, সমাজনীতি ও বিদ্যোৎসাহিতার জন্য তিনি 'মহান' আখ্যা লাভ করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর ঃ আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর নাম ধারণ করে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। প্রথমেই তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র খশরুর বিদ্রোহ কঠোর হাতে দমন করেন। খশরুকে অর্থসাহায্যের জন্য শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনমলকে তিনি প্রাণদণ্ড দেন। ফলে শিখ সম্প্রদায় মুঘল শাসন-বিরোধী হয়ে যায়।

জাহাঙ্গীর বর্ধমানের শাসনকর্তা শের আফগানকে হত্যা করে তাঁর স্ত্রী মেহরুন্নিসাকে বিয়ে করেন। এই মেহরুন্নিসা পরে 'নূরজাহান' (অর্থঃ জগতের আলো) নামে খ্যাতিলাভ করেন ও সিংহাসনের নেপথ্যে আসল শক্তি হয়ে দাঁড়ান।

জাহাঙ্গীর

আকবরের আমলে আরব্ধ যুদ্ধ জাহাঙ্গীরের আমলে চলতে থাকে। পাঠান সেনাপতি ওসমান খাঁ ও যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্যকে মানসিং পরাজিত করেন। বাংলা-দেশে মুঘল আধিপত্য সুদৃঢ় হয়। রাণা অমরসিংহ জাহাঙ্গীরের তৃতীয় পুত্র খুর্‌রমের (পরে শাহ্‌জাহান) হাতে পরাস্ত হয়ে সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করেন। খুর্‌রম আহম্মদ-নগরের দুর্গও অধিকার করেন। খুশী হয়ে জাহাঙ্গীর খুর্‌রমকে

'শাহ্‌জাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৬২৭ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর দেহত্যাগ করেন।

শাহ্‌জাহান ঃ জাহাঙ্গীরের পর সম্রাট হন শাহ্‌জাহান। তাঁর আমলে (১৬২৭-১৬৫৮ খ্রীঃ) মুঘল গৌরব-সূর্য মধ্য আকাশে উঠেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি বেড়ে যায়। সমগ্র আহম্মদনগর অধিকৃত হয়, গোলকুণ্ডার সুলতান বার্ষিক করদানে বাধ্য হন। শাহজাহান স্বয়ং বিজাপুর জয় করেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য স্থাপিত হয়। শাহ্‌জাহান কান্দাহার জয় করলেও, কয়েক বছর পর বিতাড়িত হন, মুঘলরা আর কোনদিন তা পুনরধিকার করতে পারে নি।

শাহ্‌জাহান

শাহ্‌জাহানের শেষ জীবন তাঁর চার পুত্রের বিবাদে কণ্টকিত। নিজপুত্র ঔরঙ্গজীবের হাতে বন্দী অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ঔরঙ্গজীব ঃ শাহ্‌জাহানের চার পুত্র দারা, সুজা, ঔরঙ্গজীব এবং মুরাদের মধ্যে ঔরঙ্গজীব ছিলেন সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও সাহসী। তিনি দারা ও মুরাদকে হত্যা করেন, সুজা আরাকানে পালিয়ে ওখানেই মারা যান। পিতা শাহ্‌জাহানকেও তিনি আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রেখেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) তিনি রাজত্ব করেছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি তাঁর আমলেই সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়। দাক্ষিণাত্যের বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা মুঘল-সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। কিন্তু তাঁর আমলেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। তিনি ছিলেন গোঁড়া সুন্নী মুসলমান এবং অসম্ভব

ঔরঙ্গজীবের সময়ে
মোগল সাম্রাজ্য
সীমা
কাবুল
কাশ্মীর
শ্রীনগর
গজনী
কান্দাহার
মুলতান
প্যানিপথ
দিল্লী
আগ্রা
গোয়ালিয়র
এলাহাবাদ
পাটনা
আসাম
মেবার
আমেদাবাদ
গণ্ডোয়ানা
চট্টগ্রাম
কটক
দিউ
বেরার
ঔরাঙ্গাবাদ
বোম্বাই
আহম্মদনগর
সাতারা
বিজাপুর
গোলকুণ্ডা
গোয়া
বেলারী
মাদ্রাজ
মাদুরা
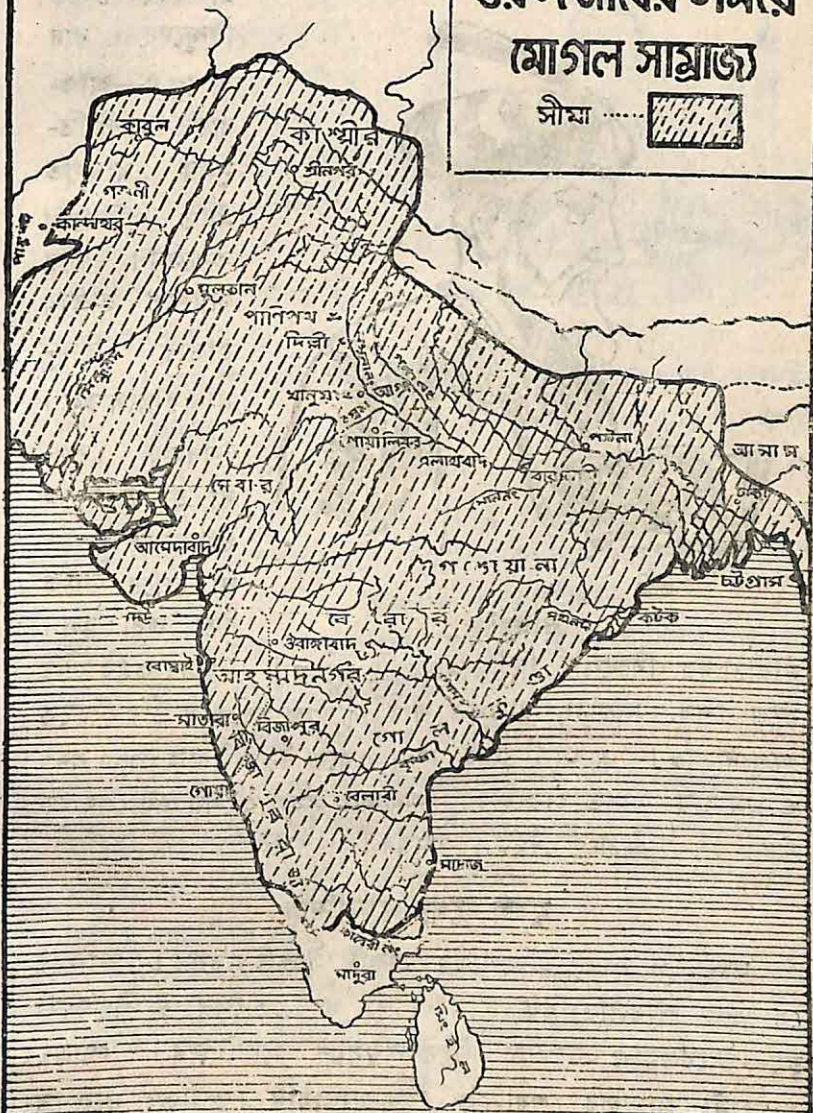
হিন্দু-বিদ্বেষী। আকবর জিজিয়া কর হিন্দুদের ওপর থেকে তুলে নিয়েছিলেন, কিন্তু ঔরঙ্গজেব তা আবার বসালেন। যতদূর সম্ভব রাজকার্য থেকে হিন্দুদের বাদ দিলেন—আকবরের সম্প্রীতিমূলক রাজপুত নীতি পরিত্যাগ করলেন। তাঁর আদেশে হাজার হাজার হিন্দু-মন্দির ধ্বংস হল। শিখগুরু তেগবাহাদুরকে ধর্মান্তরিত করতে না পেরে তাঁকে হত্যা করা হল।

ঔরঙ্গজীব

মারাঠাদের বিরুদ্ধেও তিনি অস্ত্রধারণ করেন। এইসব কর্মকাণ্ডের ফলে শিখ, মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, বুন্দেলা সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। এদের বিদ্রোহ দমন করতে ঔরঙ্গজীবকে প্রচুর সময় ও শ্রম ব্যয় করতে হয়েছিল। অবশেষে মুঘল বংশের এই শেষ বড় সম্রাট ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন।

মুঘল যুগের নানাদিক

মুঘল যুগ ভারত-ইতিহাসের একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। আকবর যে সুদক্ষ আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন তা দীর্ঘস্থায়ী হয়—ইংরেজরাও বহুক্ষেত্রে এটিকে অনুসরণ করেছিলেন। এছাড়া, সুলতানী আমলের শেষদিকে হিন্দ-মুসলমান সম্প্রীতির ফলে যে সমন্বয়বাদী সংস্কৃতির উদ্ভব হয় মুঘল যুগে তার ধারা অব্যাহত থাকে। স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, সঙ্গীত ও সাহিত্যে সর্বত্রই এর সুস্পষ্ট প্রভাব

দেখা যায়। অসংখ্য মুঘল স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—'আগ্রার দুর্গ', দিল্লীর 'লালকেল্লা', ফতেপুর সিক্রির 'বুলন্দ-দরওয়াজা', সেকেন্দ্রায় আকবরের 'সমাধি সৌধ', 'দেওয়ান-ই-আম', 'দেওয়ান-ই-খাস' ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং যা পৃথিবীর সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম, তা হচ্ছে সম্রাট শাহ্‌জাহানের আদেশে নির্মিত প্রিয় পত্নী মমতাজমহলের সমাধি-সৌধ 'তাজমহল'। আবার 'রাজপুত চিত্র' ও কাংড়ার 'পাহাড়ী চিত্র' নতুন চিত্রশিল্পধারার সাক্ষ্য। বিস্ময়কর সঙ্গীত প্রতিভা মিঞা তানসেন, হরিদাস স্বামী, বৈজু বাওরা মুঘল সঙ্গীত শিল্পকে বিশিষ্টতা দান করেছিলেন। পারসিক সাহিত্য আবুল ফজল, ফৈজী ঘিজ্‌লী, হিন্দী সাহিত্য সুরদাস ও তুলসীরাম, বাংলা সাহিত্য কাশীরাম দাস ও মুকুন্দ রাম প্রমুখের দানে সমৃদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া উর্দু ও মারাঠী সাহিত্যেরও উন্নতি ঘটেছিল।
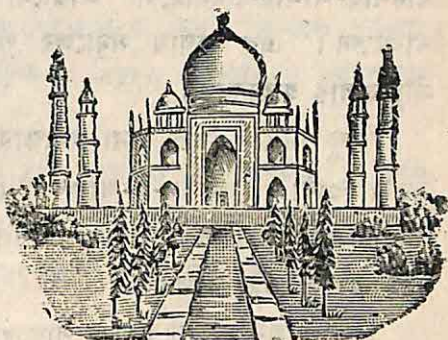
তাজমহল

॥ মুঘল আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

মুঘল যুগে সমাজ ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপাদানগুলি হল—ইউরোপীয় পর্যটকদের বিবরণ, বাণিজ্য-কুঠির কাগজপত্র, বাবর ও জাহাঙ্গীরের আত্মজীবনী, আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সাহিত্য।

সামাজিক অবস্থা ঃ মুঘল আমলের সমাজব্যবস্থা ছিল সামন্ত-তান্ত্রিক। সম্রাট ছিলেন সমাজের শিরোমণি। তাঁর রাজদরবার, ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর চোখ ধাঁধিয়ে দিত। তারপর ছিল অভিজাতরা—আমীর-ওমরাহ্‌রা। তাঁরা ছিলেন খুবই প্রতাপশালী। তখনও প্রকৃত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে নি। সুতরাং তার পরেই ছিল

জনসাধারণ। তাদের অধিকাংশই ছিল দরিদ্র কৃষক ও শ্রমজীবী। বাদশাহ-আমীর-ওমরাহ্‌রা আরামে, বিলাসে ও ব্যভিচারে মগ্ন থাকতেন। এক কথায় সমাজের ওপর তলায় ছিল প্রাচুর্য আর নীচু তলায় হাহাকার।

হিন্দু সমাজে ছিল নানা কুসংস্কার, যথা—বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, সতীদাহপ্রথা। 'আইন-ই-আকবরী' থেকে জানা যায় যে, ক্রীতদাস প্রথাও প্রচলিত ছিল। একমাত্র মুঘল সম্রাট আকবর সতীদাহপ্রথা দমন করতে চেষ্টা করেন।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল। উভয়ে উভয়ের ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করত। হিন্দুরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। মুঘল বাদশাহরা সকলেই ইসলাম ধর্মে নিষ্ঠাবান ছিলেন। ঔরঙ্গজেব অবশ্য অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। ধর্মে আকবরের চরিত্রে ছিল আশ্চর্য উদারতা। সর্বধর্মের সার-সংগ্রহ করে তিনি 'দীন ইলাহী' নামে এক নতুন ধর্মমত প্রচার করেন (১৫৮১ খ্রীঃ)। সুলতানী যুগের হিন্দু-মুসলমান সমন্বয়বাদ সার্থক রূপলাভ করে তাঁর রাজত্বকালে।

অর্থ নৈতিক অবস্থা ঃ সুলতানী আমলের মতই মুঘল আমলেও কৃষিই ছিল অর্থনীতির ভিত্তি। কৃষি ছিল বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল. কৃষকের তুলনায় কৃষি জমির প্রাচুর্য ছিল। অরণ্যাঞ্চল থাকায় পশুপালনেরও সুবিধে ছিল। বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের ব্যবস্থা ভাল ছিল না। কখনও কখনও খাজনা মকুব করা হত ও কৃষিঋণ দেওয়া হত। প্রধান খাদ্য-শস্যের মধ্যে ছিল গম ও যব। এ ছাড়া, আখ, তুলো, নীল ও রেশমের চাষ হত।

মুঘল আমলে শিল্প-বাণিজ্যেরও উন্নতি ঘটেছিল। ভারতীয় সূতী ও রেশম বস্ত্র বিদেশে সমাদৃত হত। রপ্তানি-বাণিজ্য উন্নত থাকায় বিদেশ থেকে ভারতে আমদানি হত প্রচুর সোনা-রূপো। একালে যে সমস্ত ভারতীয় বন্দর প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তাদের মধ্যে সুরাট, মসুলিপত্তম্, গোয়া, কালিকট, কোচিন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। আবুল ফজল বলেছেন ঃ

একটি গরুর দাম ছিল দশ টাকা আর এক টাকায় মিলত চারটি ছাগল। অবশ্য সাধারণ মানুষের উপার্জন ছিল খুবই কম।

॥ **বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত** ॥ মুঘল আমলে ভারতে এসেছিলেন বহু ইউরোপীয় পর্যটক। এঁদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে বহু তথ্য পাওয়া যায়।

আকবরের রাজত্বকালে ভারতে আসেন **রাল্‌ফ ফিচ**। তিনি আগ্রা ও ফতেপুর সিক্রির ঐশ্বর্য ও আয়তন দেখে বিস্মিত হন। তিনি লিখেছেন ঃ বাংলার স্থবর্ণগ্রামে অতি সূক্ষ্ম ও মনোরম বস্ত্র তৈরি হত।

জাহাঙ্গীরের আমলে এসেছিলেন **উইলিয়ম হকিন্স ও স্যার টমাস রো** নামে দুজন ইংরেজ ও **পেলসার্ট** নামে পর্তুগীজ পর্যটক। হকিন্স মুঘল রাজদরবারের জাঁকজমক ও ঐশ্বর্যের কথা লিখেছেন। টমাস রো জাহাঙ্গীরের আড়ম্বরপ্রিয়তা, মদ্যপান, তাঁর বিচার সভার কথা এবং শাসন-শৃঙ্খলা ও সামরিক শক্তির অবনতির কথা লিখেছেন। পেলসার্ট লিখেছেন ঃ ভারতের শস্যক্ষেত্র উর্বর হলেও শাসন কর্তৃপক্ষের অত্যাচারে কৃষিকর্মের উন্নতি হয়নি। বাংলাদেশে রেশম ও বস্ত্রশিল্প অনেক উন্নতি লাভ করেছিল ইত্যাদি।

শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে ফরাসী বণিক **ট্যাভার্নিয়ার** ও ফরাসী চিকিৎসক **বের্নিয়ার** এসেছিলেন। ট্যাভার্নিয়ার ভারতের আভ্যন্তরীণ অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি সম্বন্ধে বলেছেন। বের্নিয়ার বলেছেন, ঔরঙ্গজীবের বুদ্ধি ও কর্মদক্ষতার কথা, দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির কথা। ধনীরাই দেশের অধিকাংশ সম্পদ ভোগ করত। সাধারণ মানুষের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না—তারা অত্যাচারিত হত রাজকর্মচারীদের দ্বারা। বাংলাদেশের অবস্থা তুলনায় ভাল ছিল। সেখানে ছিল ফল ও শস্যের প্রাচুর্য।

ঔরঙ্গজীবের সময় এসেছিলেন ইটালীয় পর্যটক **মানুচ্চি**। তিনি বলেছেন ঔরঙ্গজেবের ঐশ্বর্য এবং সাধারণ মানুষের আর্থিক দুর্গতির কথা।

॥ মুঘল সাম্রাজের পতন ॥ ঔরঙ্গজীবের আমলেই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা হয়েছিল, তাঁর দুর্বল উত্তরাধিকারীদের সময়ে তা দ্রুত পতনের দিকে এগোতে থাকল। ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তিন পুত্র মুয়াজ্জম, আজম ও কামবক্সের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ দেখা দিল। মুয়াজ্জম দুই ভাইকে হত্যা করে বাহাদুর শাহ্ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। মাত্র পাঁচ বছর রাজত্ব করে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্র জাহান্দার, শাহ্ আজিম-উস-শান, জাহান শাহ্ ও রফি-উস-শানের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে বিবাদ শুরু হল। অবশেষে জাহান্দার তিন ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসলেন। কয়েকমাস রাজত্বের পর তিনি সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। এর পেছনে ছিল সৈয়দ আবদুল্লাহ্ এবং হুসেন আলি খাঁ, যাঁরা সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নামে কুখ্যাত। তাঁরাই এবার আজিম-উস-শানের পুত্র ফারুকশিয়ারকে সিংহাসনে বসালেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। ফারুকশিয়ার হলেন সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হাতের পুতুল। ছ'বছর রাজত্বের পর এঁদের চক্রান্তে তিনি নিহত হলেন।

অতঃপর সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় পরপর বাহাদুর শাহের দুই পৌত্রকে সিংহাসনে বসান। এঁদের মৃত্যু ঘটলে তাঁরা জাহান্দারের পুত্র মহম্মদ শাহ্‌কে সিংহাসনে বসান। মহম্মদ শাহ্ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা করে স্বাধীনভাবে উনত্রিশ বছর রাজত্ব করেন (১৭১৯-৪৮ খ্রীঃ)। তাঁর শাসনকালে মুঘল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। দাক্ষিণাত্য, অযোধ্যা, বাংলা হাতছাড়া হয়ে গেল, মারাঠা আধিপত্য বিস্তৃত হল; জাঠ, রোহিলা দিল্লীর অধীনতা অস্বীকার করল, পাঞ্জাবে শিখদের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা রইল না। অবশেষে পারস্যরাজ নাদির শাহ্ ভারত আক্রমণ (১৭৩৯ খ্রীঃ) করে মুঘল সাম্রাজ্যে চরম আঘাত হানলেন। নাদির শাহ্ অজস্র ধনরত্ন, ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর মণি নিয়ে গেলেন। কাবুল ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বাদশাহের হাতছাড়া হয়ে গেল।

পরবর্তী বাদশাহ্ আহম্মদ শাহের রাজত্বকালে ঘটল আফগান নায়ক আহম্মদ শাহ্ দুররানীর (আবদালি) ভারত আক্রমণ। ফলে পাঞ্জাব ও মুলতান বাদশাহের হাতছাড়া হল। এইভাবে

ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর ষাট বছরের মধ্যে বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হয়ে সামান্য ভূখণ্ডে পরিণত হল।

আহম্মদ শাহের পর দ্বিতীয় আলমগীর, দ্বিতীয় শাহ্ আলম, দ্বিতীয় আকবর এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ পরপর সিংহাসনে বসেন। এঁদের রাজ্যসীমা দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সীমিত হয়ে পড়ে। অবশেষে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদানের অপরাধে সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে ইংরেজ সরকার রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে। ভারতবর্ষে মুঘল শাসনের বিলুপ্তি ঘটে।

ভারতে ইউরোপীয়দের আগমন

ভারতবর্ষের সঙ্গে পরোক্ষভাবে ইউরোপের বাণিজ্য চলে আসছিল বহুদিন থেকেই। ভারতের পণ্য আরবরা ভূমধ্যসাগরের তীরে নিয়ে যেত। ইটালীর বণিকরা তা কিনে ইউরোপের নানা অঞ্চলে চালান দিত। এতে আরব ও ইটালীয় বণিকরা ধনী হয়ে ওঠে।

এদের দেখাদেখি মণিমুক্তো ও মসলার দেশ ভারতের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য করার জন্য ইউরোপের অন্যান্য দেশের বণিকেরা ভারতে আসতে লাগল। সবার আগে এসেছিল পর্তুগীজরা।

॥ পর্তুগীজ বণিকরা ॥ ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে **ভাস্কো-ডা-গামা** জলপথে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। ধীরে ধীরে পর্তুগীজরা চৌল, বোম্বাই, সলসেট, বেসিন, গোয়া, দমন, দিউ এবং বঙ্গদেশের হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। গোয়ার পর্তুগীজ শাসনকর্তা আল্‌বুকার্ক ১৫০৯ থেকে ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পর্তুগীজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। চট্টগ্রামেও তাদের আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয়দের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করা, বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রি, জলদস্যুতা ইত্যাদিতে বিরক্ত হয়ে সম্রাট শাহ্‌জাহান হুগলী থেকে তাদের বিতাড়িত করেন। পরে মারাঠারা পর্তুগীজদের শক্তি খর্ব করে। ক্রমে গোয়া, দমন ও দিউ ছাড়া সমস্ত ভারতীয় অঞ্চল তাদের হাতছাড়া হয়ে যায়।

॥ ওলন্দাজ বণিকরা ॥ পর্তুগীজদের পরে আসে হল্যাণ্ডের অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকরা। তারা কালিকট ও সুরাটে বাণিজ্য কুঠি

স্থাপন করে। পরে পর্তুগীজদের হাত থেকে সিংহল ও কোচিন ছিনিয়ে নেয়। এছাড়া বাংলাদেশে চুঁচূড়া, কাশিমবাজার, বরাহনগর, বিহারের পাটনা ও উড়িষ্যার বালেশ্বরে তারা বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে।

॥ ফরাসী বণিকরা ॥ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থমন্ত্রী কোলবার্টের উদ্যোগে 'ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য আরম্ভ করে। সর্বপ্রথম বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয় সুরাটে। ক্রমে মসুলিপত্তম, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি স্থানে তাদের বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়।

॥ ইংরেজ বণিকরা ॥ ইংরেজরাও ভারতে বাণিজ্য বিস্তারে এগিয়ে আসে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে একদল ইংরেজ বণিক জলপথে ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে 'ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে এবং ইংল্যাণ্ডের রানী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বৎসরের জন্য ভারতে একচেটে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। প্রায় তের বৎসর পর এই কোম্পানী সুরাটে স্থায়ীভাবে কুঠি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার টমাস রো জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে তাঁর কাছ থেকে ইংরেজ বণিকদের স্বার্থে কিছু বাণিজ্যের সুযোগ বৃদ্ধি করে যান। ক্রমে আগ্রা, আমেদাবাদ, মসুলিপত্তম প্রভৃতি জায়গায় বাণিজ্য কুঠি নির্মিত হয়। এরপর কোম্পানী চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মান্দ্রাজপট্টম নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রামের ইজারা নেয় এবং একটি দুর্গ তৈরি করে। এখানেই পরে মাদ্রাজ শহর গড়ে ওঠে। শাহ্‌জাহান পর্তুগীজদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। ইংরেজরা হুগলী, ঢাকা ও কাশিমবাজারে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়। পরে তাদের বাণিজ্য-ঘাঁটি গড়ে ওঠে বোম্বাইয়ে।

এরপর কোম্পানীর সঙ্গে ঔরঙ্গজীবের সংঘর্ষ হয়। ইংরেজরা ক্ষমা চাইলে তিনি তাদের বাংলায় অবাধ বাণিজ্যের সুবিধে দেন। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে জব চার্নক বাংলার নবাবের কাছ থেকে সুতানুটি গ্রামে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। দু'বছর পর সুতানুটি,

গোবিন্দপুর ও কালিঘাট—এই তিনটে গ্রামের জমীদারী ইংরেজরা লাভ করে। এইভাবে কলকাতার পত্তন হয়। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে সেখানে ফোর্ট উইলিয়াম ছুর্গের নির্মাণ শেষ হয়। এভাবে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি প্রধান ইংরেজ বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাণিজ্যের পথ ধরেই ইংরেজ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

॥ অন্যান্য বণিকরা ॥ ডেনমার্ক ও সুইডেনবাসীরাও ভারতে বাণিজ্য করতে এসেছিল কিন্তু তাদের ভূমিকা ছিল খুবই অনুজ্জ্বল।

॥ দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা ॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের ভগ্নদশা তখন ভারত পরিণত হয়েছিল ভাগ্যান্বেষীদের এক স্বর্গরাজ্যে। ইংরেজ ও ফরাসী বণিকরা নিজ নিজ শক্তি বৃদ্ধি ও রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হয়। ফলে উভয়ের মধ্যে দেখা দিল প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কেন্দ্র ছিল দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটক রাজ্য। যখনই দাক্ষিণাত্যের কোন রাজ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দিত তখনই দেখা যেত একপক্ষে ইংরেজ আর অন্যপক্ষে ফরাসীরা যোগদান করেছে।

দুপ্লে

১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। যুদ্ধটি ভারতেও ছড়িয়ে যায়। সে সময়ে ধুরন্ধর রাজনীতি-বিদ্ দুপ্লে ছিলেন পণ্ডিচেরীর শাসনকর্তা। তাঁর অনুরোধে কর্ণাটকের আনোয়ার-উদ্দীন তাঁর এলাকায় যুদ্ধ করতে বারণ করলেন ইংরেজদের। ফলে ইংরেজরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করতে পারল না। ১৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী নৌ-সেনাপতি লা-বুরদনে মাদ্রাজ দখল করলেন। এতে ক্রুদ্ধ হয়ে নবাব আনোয়ারউদ্দীন ফরাসীদের বিরুদ্ধে সৈন্য পাঠালেন। কিন্তু নবাব পরাজিত হলেন। এরপর ইংরেজরাও ফরাসীদের হাতে পরাজিত হয়। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে যুদ্ধের অবসান হয়। ফলে ফরাসীরা ইংরেজদের মাদ্রাজ প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য হয়। এইভাবে **প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ** শেষ হয়।

॥ দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ॥ প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ শেষ হতে না

হতেই আবার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শুরু হল দ্বিতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ (১৭৪৯-৫৪ খ্রীঃ)। কর্ণাটকের নবাবের পদ নিয়ে আনোয়ার-উদ্দিন ও চাঁদা সাহেবের মধ্যে আর নিজামের সিংহাসন নিয়ে নাসির জঙ্গ ও মুজফ্‌ফরজঙ্গের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হল। ডুপ্লে মুজফ্‌ফর-জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবকে সমর্থন করলেন। ইংরেজরা নাসিরজঙ্গ ও আনোয়ারউদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র মহম্মদ আলিকে সমর্থন করল। এই যুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে ডুপ্লে জয়লাভ করায় হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটকে ফরাসী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অধিনায়ক ক্লাইভের চাতুর্যে ও বীরত্বে আর্কট ইংরেজদের হস্তগত হয় এবং ত্রিচিনাপল্লীতে ফরাসীরা পরাজিত হয়। অবশেষে ফ্রান্সের কর্তৃপক্ষের নির্দেশে ডুপ্লেকে দেশে ফিরতে হয়। এরপর ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি-স্থাপিত হল।

রবার্ট ক্লাইভ

॥ তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ ॥ ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্র ধরে আবার ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ভারতে যুদ্ধ বেধে যায়। এই যুদ্ধ তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে পরিচিত এবং শুরুতেই ইংরেজরা সাফল্যলাভ করে। এদিকে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে বাংলায় ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসী সেনাপতি লালী কর্ণাটকের যুদ্ধে প্রথমদিকে সাফল্যলাভ করলেও শেষরক্ষা করতে পারেন নি। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ইংরেজ সেনাপতি স্যার আয়ারকুটের হাতে পরাজিত হন বন্দীবাসের যুদ্ধে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধি অনুসারে ইউরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের অবসান হয়। ভারতবর্ষে ফ্রান্স কিছু কিছু জায়গা ফিরে পেল কিন্তু তাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হল যে, জায়গাগুলো কেবলমাত্র বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেই থাকবে। এইভাবে

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা নির্মূল হয়, অন্যদিকে ইংরেজদের সেই আশা দৃঢ়মূল হল।

মারাঠা ও শিখ জাতীর উত্থান

ফরাসীদের পরাজয়ের পর ভারতে ইংরেজদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার মত শক্তি আর রইল না বললেই চলে। দিল্লীর মুঘল শাসনের তখন ভগ্নদশা, হায়দ্রাবাদের নিজাম শুধু নামেই শাসক। অবশ্য তখনও ছিল মারাঠারা এবং শিখরা—এদের বিরুদ্ধে ইংরেজদের পরে যুঝতে হয়েছিল। মুঘলদেরও এরা বিস্তর অসুবিধার সৃষ্টি করেছিল। এই দুই জাতির উত্থান কাহিনী খুবই চিত্তাকর্ষক। প্রথমে মারাঠাদের কথা আলোচনা করা যাক।

॥ শিবাজী ও মারাঠা সাম্রাজ্য ॥

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুদয় ভারত-ইতিহাসের বিশিষ্ট ঘটনা। মারাঠা ক্ষাত্র শক্তির এই প্রবাদপুরুষ পুনের অন্তর্গত শিবনের গিরিদুর্গে জন্মেছিলেন (১৬২৭ খ্রীঃ)। তাঁর পিতা শাহজী বিজাপুরের সুলতানের সেনানী ছিলেন। মা জীজাবাঈ ও অভিভাবক দাদাজী কণ্ডদেবের কাছ থেকে রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শুনে তিনি বালক বয়সেই দক্ষিণ ভারতে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য-গঠনের স্বপ্ন দেখতেন।

মহারাষ্ট্রের দুর্ধর্ষ উপজাতি মাওয়ালীদের শিক্ষা দিয়ে শিবাজী এক সুগঠিত সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। এদের সাহায্যেই মাত্র উনিশ বৎসর বয়সে তিনি বিজাপুরের তোরণা দুর্গ দখল করেন, রায়গড়ে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন।

কিছুকাল পর শুরু হল মুঘল-মারাঠা সংগ্রাম। শিবাজীকে দমনের উদ্দেশ্যে বিজাপুরের সুলতান আফজল খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পাঠান। কিন্তু শিবাজী প্রতাপগড়ের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় নেন। অবশেষে আফজল খাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় শিবাজী তাঁকে 'বাঘনখ' নামে অস্ত্রের সাহায্যে হত্যা করেন। এরপর শিবাজী দক্ষিণ কোঙ্কণ ও কোলাপুর দখল করেন।

ঔরঙ্গজীব এরপর শিবাজীকে দমনের জন্য পাঠান শায়েস্তা

খাঁকে। শায়েস্তা খাঁ কয়েকটি দুর্গ অধিকার করলেও শিবাজীর কাছে বুদ্ধির খেলায় হেরে গিয়ে ফিরে যান। শিবাজী সুরাট বন্দর লুঠপাট করেন।

শিবাজী

ঔরঙ্গজীব এরপর শিবাজীর বিরুদ্ধে পাঠালেন জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে। পুরন্দর দুর্গ অবরুদ্ধ হলে শিবাজী সন্ধি করতে বাধ্য হন। পুরন্দরের সন্ধি অনুযায়ী ১২টি দুর্গ ছাড়া সমস্ত দুর্গ তিনি মুঘলদের হাতে সমর্পণ করেন। অনুরুদ্ধ হয়ে শিবাজী ঔরঙ্গজীবের সঙ্গে আগ্রায় মুঘল দরবারে যান। কিন্তু স্বাধীন নৃপতিসুলভ ব্যবহার না পাওয়ার প্রতিবাদ করলে ঔরঙ্গজীব তাঁকে বন্দী করেন। শিবাজী কৌশলে কারাগার থেকে পালিয়ে আসেন। এরপরই শুরু হয় মুঘলদের বিরুদ্ধে তাঁর আপসহীন সংগ্রাম।

শিবাজী দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন করেন এবং মুঘল অধিকৃত প্রদেশগুলি থেকে চৌথ বা রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ আদায় করেন। ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছত্রপতি উপাধি ধারণ করেন এবং তাঁর অভিষেক হয়। ছয় বৎসর পর তাঁর দেহান্ত ঘটে।

॥ শিবাজীর বংশধররা ॥ শিবাজীর বংশধররা কিন্তু শিবাজীর মত প্রতিভাধর ছিলেন না। তাঁর পুত্র শম্ভাজীকে ঔরঙ্গজীবের আদেশে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। পরবর্তী শাসক রাজারাম মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধকালে মারা যান। এরপর একদিকে রাজারামের শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজী, অন্যদিকে শম্ভাজীর পুত্র শাহুকে কেন্দ্র করে মারাঠারা দুটি বিবদমান গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়।

॥ পেশোয়াদের অধীনে মারাঠাদের রাজ্যবিস্তার ॥ রাজা শাহুর রাজত্বকালে মারাঠাদের প্রধানমন্ত্রী পেশোয়াই আসল শক্তি হয়ে

দাঁড়ালেন রাজাকে নেপথ্যে সরিয়ে। পরে এই পদ বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়ায়। পেশোয়া বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল সম্রাট ফারুক-শিয়ারের সঙ্গে চুক্তি করে দাক্ষিণাত্যের ছ'টি সুবা থেকে চৌথ ও সরদেশমুখী কর আদায়ের অধিকার পান। তাছাড়া শিবাজী-শাসিত অঞ্চলগুলিও ফিরে পান। এর বিনিময়ে সম্রাটের প্রয়োজনে ১৫ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য ও বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি তিনি দেন। মুঘল সম্রাটের সঙ্গে এই মিত্রতার ফলে প্রায় সমগ্র দাক্ষিণাত্য মারাঠাদের প্রভাবাধীন হয়ে পড়ে।

বালাজী বিশ্বনাথের পর পেশোয়া পদ লাভ করেন বাজীরাও। তিনি মারাঠা রাজ্যকে কেন্দ্র করে 'হিন্দুপাদ পাদশাহী' বা হিন্দুরাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখতেন। তিনি মুঘল শক্তিকে পরাজিত করে মালব ও গুজরাট অধিকার করেন। অনেক হিন্দু রাজার সমর্থন তিনি পান। হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মুঘল সম্রাটদের মিলিত বাহিনীকে তিনি ভূপালের কাছে পরাজিত করেন। পর্তুগীজদের পরাজিত করে তিনি সলসেট ও বেসিন অধিকার করেন।

বাজীরাও-এর পুত্র বালাজী ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে পেশোয়া পদ লাভ করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুজী ভোঁসলে সম্রাটের পক্ষে তাঁর বিরোধিতা করায় তিনি বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। তাঁর সেনা-পতিদের নির্বিচারে লুটপাঠের ফলে রাজপুত, শিখ ও জাঠেরা ক্ষুব্ধ হয়। 'হিন্দুপাদ পাদশাহীর' আদর্শ বিনষ্ট হয়। অবশ্য মারাঠাদের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে। তারা উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু পাঞ্জাব দখল করার পর আফগান শক্তির সঙ্গে মারাঠাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। আফগানরাজ আহম্মদ শাহ্ দুর্‌রানী উন্নততর রণকৌশলে **পাণিপথের** তৃতীয় যুদ্ধে (১৭৬১ খ্রীঃ) মারাঠাদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। মারাঠাদের স্বরাজ্য স্থাপনের আশা ধূলিসাৎ হল।

॥ শিখদের অভ্যুত্থান ॥

এবারে আসা যাক গুরু নানক প্রতিষ্ঠিত শিখ সম্প্রদায়ের অভ্যুত্থানের কথায়। নানক ও তাঁর পরবর্তী তিনজন গুরু—

অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস সকলেই ধর্মবিষয়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, রাজনীতিতে নয়।

পঞ্চম গুরু অর্জুনমল শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ 'আদি গ্রন্থ' সঙ্কলন করেন। শিখ সম্প্রদায়ের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি শিষ্যদের স্বেচ্ছায় অর্থদানের পরিবর্তে বাধ্যতামূলক করদানের প্রথা প্রবর্তন করেন। জাহাঙ্গীরের পুত্র খশ্‌রু বিদ্রোহী হলে তিনি তাঁকে অর্থসাহায্য দেন। এতে জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হয়ে অর্জুনকে প্রাণদণ্ড দেন। এর পরই শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্য রাজনীতিতে প্রবেশ করে।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ তাঁর অপূর্ব সংগঠনী শক্তিবলে শিখদের যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন।

নবম গুরু তেগ বাহাদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় ঔরঙ্গজীব তাঁকে হত্যা করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্বের কথা—"শির দিয়া, সার না দিয়া" (অর্থ : মাথা দিচ্ছি কিন্তু ধর্ম দিচ্ছি না) —শিখদের মাতিয়ে তুলেছিল।

দশম ও সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখদের কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলাবদ্ধ করে সুগঠিত করেন। তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠে খালসা (অর্থ : পবিত্র) বাহিনী। তিনি জাতিভেদ উচ্ছেদ করেন এবং কেশ (লম্বা চুল), কঙ্ঘ (চিরুণী), কড়া (ইস্পাতের বালা), কচ্ছ (কৌপিন) এবং কৃপাণ (তরবারি)—এই পঞ্চ 'ক' শিখদের সর্বদা ধারণ বাধ্যতামূলক করেন। দাক্ষিণাত্যে এক আততায়ীর ছুরিকাঘাতে তিনি প্রাণ হারান।

এরপর গুরু গোবিন্দের অনুচর বান্দা শিখদের নেতৃত্ব লাভ করেন। গুরু গোবিন্দের পুত্রদের হত্যাকারী শিরহিন্দের ফৌজদার ওয়াজির খাঁকে তিনি পরাজিত ও হত্যা করে প্রতিশোধ নেন এবং শহরটি দখল করেন। অল্পকাল পরে বন্দী অবস্থায় সম্রাট ফারুক-শিয়ারের কাছে উপস্থিত হলে বান্দার সম্মুখেই তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হয় ও তাঁকে হাতীর পায়ের নিচে ফেলে হত্যা করা হয়। অবশ্য উৎপীড়ন সত্ত্বেও শিখশক্তি নিঃশেষিত হয় নি। উনিশ শতকের প্রথম দিকে রঞ্জিৎ সিংহের নেতৃত্বে শিখরা দুর্জয় হয়ে ওঠে।

সপ্তম অধ্যায়

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূচনা ও বিস্তার

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ড-রূপে।" ইংরেজরা আমাদের দেশে এসেছিল বাণিজ্য করতে, কিন্তু কালক্রমে তারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভ করে ক্লাইভ ভারতে সেই সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। এর পরবর্তী একশো বছর (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) ধরে চললো ব্রিটিশদের সাম্রাজ্য-বিস্তারের পালা। মারাঠা, শিখ আর মহীশূর রাজ্যের জোরালো বাধা অতিক্রম করে ইংরেজরা ছলে-বলে-কৌশলে একটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলে ভারতবর্ষে।

॥ বাংলায় ইংরেজ শাসনের সূচনা ॥ পলাশীর যুদ্ধ ॥ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে শুরু হয়েছিল সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ। ঐ বছরেই মারা যান বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব আলিবর্দী খাঁ এবং তাঁর তরুণ দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা মসনদে বসলেন। ইংরেজরা স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে ঐ সিংহাসনের অন্য দাবিদারদের সমর্থন করলে সিরাজ তাদের ওপর রুষ্ট হন। এছাড়া, ফরাসীরা তাদের আক্রমণ করবে এই অজুহাতে সিরাজের পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের কলকাতার দুর্গের সংস্কার করতে থাকে। তারা অবৈধভাবে বাণিজ্যও করছিল। সুতরাং সিরাজ কলকাতার দুর্গ আক্রমণ করলেন। ইংরেজরা ভীত হয়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু শীগ্‌গীর মাদ্রাজ থেকে এলেন কর্ণাটকের বিজয়ী ক্লাইভ ও ওয়াটসন। ক্লাইভ অনায়াসে কলকাতার দুর্গ পুনরুদ্ধার করলেন (২রা জানুয়ারী, ১৭৫৭ খ্রীঃ)। ফলে ইংরেজরা ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রচুর অর্থ, দুর্গনির্মাণ ও মুদ্রা প্রচলনের অধিকার পেল। এর পর ইংরেজরা সিরাজের প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, প্রতাপশালী ব্যক্তি জগৎ শেঠ, রাজবল্লভ ইত্যাদির সঙ্গে সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করার এক ষড়যন্ত্র করল।

পলাশীর যুদ্ধ ঃ এই ষড়যন্ত্রের ফলে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন তারিখে পলাশীর (বর্তমানে নদীয়া জেলায়) আম্রকাননে সিরাজের সঙ্গে ইংরেজদের এক যুদ্ধের প্রহসন হল। বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর যুদ্ধে অংশই নিলেন না। সিরাজ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হলেন। তাঁকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। ইংরেজরা মীরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরাই রাজত্ব করতে থাকল। এই-ভাবে ক্লাইভ বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করলেন। কিছুকাল পর মীরজাফরের কাছ থেকে আশানুযায়ী অর্থ না পাওয়ায় ইংরেজরা তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে মসনদে বসাল।

সিরাজউদ্দৌলা

বক্সারের যুদ্ধ ঃ স্বাধীনচেতা মীরকাশিম পুরোপুরি ইংরেজদের হাতের পুতুল না হওয়ায় ইংরেজদের সঙ্গে তার যুদ্ধ বেধে যায়। মীরকাশিম পরপর তিনটি যুদ্ধে পরাজিত হন। অবশেষে তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা ও নামসর্বস্ব মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ্ আলমকে নিজ পক্ষভুক্ত করলেন। কিন্তু বক্সারের রণক্ষেত্রে এই সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজদের হাতে পরাজিত হল।

বক্সারের যুদ্ধের ফলে মুঘল সম্রাট ও অযোধ্যার নবাব ইংরেজদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লেন। বাংলা তথা ভারতে ইংরেজদের ক্ষমতা বহুগুণ বেড়ে গেল। পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ আধিপত্যের যে সূচনা হয়েছিল তারই পরিণতি ঘটল বক্সারের যুদ্ধে।

॥ কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ ॥ বক্সারের যুদ্ধের পর ক্লাইভ দ্বিতীয়বার গভর্নর হয়ে এলেন। তিনি অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে এলাহাবাদের সন্ধি স্বাক্ষর করলেন। শর্তানুযায়ী নবাব

কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা এবং কারা ও এলাহাবাদ অঞ্চল দিলেন। ক্লাইভ এরপর মুঘল সাম্রাটের সঙ্গে সন্ধি করলেন। তিনি সম্রাটকে কারা ও এলাহাবাদ উপহার দিলেন, পরিবর্তে বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করলেন। এছাড়া, বাংলার নবাবের শাসন পরিচালনার ব্যয়ের জন্য কোম্পানী বার্ষিক তিপান্ন লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হল।

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর পর থেকে কোম্পানী রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী মামলার বিচারের দায়িত্ব পেল। এইভাবে দেওয়ানী লাভের মাধ্যমে ক্লাইভ এদেশে ইংরেজ শাসনকে দৃঢ় ও বিধিসম্মত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।

॥ ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৭২-১৭৮৫ খ্রীঃ) ॥ ওয়ারেন হেস্টিংস ক্লাইভের মত রণদক্ষ বা কূটনীতিজ্ঞ ছিলেন না। কোম্পানীর রাজ্যজয়ের ব্যাপারে বাংলার এই প্রথম গভর্নর-জেনারেলের ভূমিকা ছিল অনুজ্জ্বল। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। হায়দর আলি নামে একজন বিচক্ষণ বীরের অধীনে মহীশূর তখন একটি শক্তিশালী রাজ্য। তাঁর ক্রমবর্ধমান শক্তিতে শঙ্কিত হয়ে ইংরেজরা তাঁর ক্ষমতা হ্রাস করতে চাইল। ফলে কোম্পানীর সঙ্গে মহীশূরের চার বার যুদ্ধ হয়। হেস্টিংসের আমলে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে (১৭৬৭-৬৯ খ্রীঃ) কোন পক্ষই বিশেষ লাভবান হয় নি, আর দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৮০-৮৩ খ্রীঃ) শেষ হওয়ার আগেই হায়দর আলি মারা যান এবং তাঁর পুত্র টিপু সুলতান যুদ্ধ চালিয়ে যান। উভয় পক্ষই রণক্লান্ত হয়ে সন্ধি স্থাপন করেন পরস্পরের বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পণ করে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই মারাঠারা ছিল ইংরেজদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রথম মারাঠা যুদ্ধের (১৭৭৫-৮২ খ্রীঃ) ফলে ইংরেজরা লাভ করেছিল সলসেট নামক স্থানটি, ব্রোচ জেলার রাজস্ব আদায়ের অধিকার ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ হিসেবে বার লক্ষ টাকা।

॥ লর্ড কর্নওয়ালিস-এর আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৮৬-

১৭৯৩ খ্রীঃ)॥ লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালের অন্যতম প্রধান ঘটনা তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ (১৭৯০-৯১ খ্রীঃ)। মহীশূরের সুলতান টিপুকে ইংরেজ, মারাঠা ও হায়দ্রাবাদের নিজাম—এই ত্রিশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় এবং পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হতে হয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী ইংরেজরা মালাবার এবং সালেম ও মাদুরার কতকাংশ লাভ করে।

রাজ্যবিস্তার ব্যাপারে কর্নওয়ালিসের পরবর্তী শাসনকর্তা জন শোর-এর শাসনকাল (১৭৯৩-৯৮ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য নয়।

॥ লর্ড ওয়েলেসলির আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ)॥ ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন লর্ড ওয়েলেসলি। সাম্রাজ্য বিস্তারের এক নতুন নীতি উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি। এটি 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' বলে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বন্ধুত্বের আড়ালে ভারতীয় রাজ্যগুলিকে ইংরেজদের তাঁবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার কৌশল। ঘরোয়া ব্যাপারে মিত্রতাবদ্ধ রাজার স্বাধীনতা থাকবে, অবশ্য তাঁর রাজ্যস্থ ব্রিটিশ 'রেসিডেণ্টের' পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হবে। কোন ভারতীয় বা বিদেশী শক্তির সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া এবং ইংরেজ ছাড়া অন্য কোন ইউরোপীয়দের চাকরি দেওয়া চলবে না। ইংরেজ সরকার যুদ্ধবিগ্রহ বা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ থেকে এই মিত্রতাবদ্ধ রাজ্যগুলিকে রক্ষা করবে এবং এজন্য রাজারা নিজ খরচে একদল ব্রিটিশ সৈন্য রাখবেন। মারাঠাদের শক্তিতে ভীত হায়দ্রাবাদের নিজাম, মারাঠাদের মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড়, অযোধ্যার নবাব, পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও হয় স্বেচ্ছায়, নয় বাধ্য হয়ে, এই নীতি মেনে নেন। গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া ও বেরারের ভোঁসলা এই অধীনতা না মানায় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধল। এই দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধে (১৮০৩-১৮০৫ খ্রীঃ) শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা জয়ী হওয়ায় সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা অধীনতামূলক মিত্রতা মানতে বাধ্য হন। দিল্লী, আগ্রা, গঙ্গা-যমুনার দোয়াব, উড়িষ্যার কটক অঞ্চলে ব্রিটিশ আধিপত্য বিস্তৃত হয়।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে (১৭৯৯ খ্রীঃ) টিপু সুলতানের মৃত্যু হয়

এবং তাঁর রাজ্য ভাগাভাগি করে পশ্চিম উপকূলের জেলাগুলি ইংরেজদের অধিকারে আসে। হায়দর আলি প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটি এইভাবে ধ্বংস হয়। সুরাটের নবাব ও তাঞ্জোরের মারাঠা রাজা ইংরেজদের অধীনতা মেনে নেন। কর্ণাটক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। এইভাবে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে।

॥ **লর্ড হেস্টিংস্‌-এর আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৮১৩-১৮২৩)** ॥ ওয়েলেসলির পরে দ্বিতীয়বার কর্নওয়ালিশ এবং জর্জ বার্লো এবং মিণ্টো গভর্নর জেনারেল হন। এঁদের পর লর্ড হেস্টিংসই বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যবাদী নীতি গ্রহণ করেন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে (১৮১৭-১৮১৯ খ্রীঃ) মারাঠা শক্তি চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত হয়। পেশোয়া, ভোঁসলা ও হোলকার আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হয়ে বিঠুরে নির্বাসিত হলেন। ভোঁসলা ও হোলকারের রাজ্য খণ্ডিত হল। ভূপাল ও বুন্দেলখণ্ড ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হল। সিন্ধিয়ার প্রভাবাধীন মেবার ও জয়পুর ব্রিটিশের অধীনতা মেনে নিল।

ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধে (১৮১৪-১৬) ইংরেজরা কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং তরাই-এর বৃহদংশ লাভ করল। নেপালীরা সিকিমের ওপর দাবি ত্যাগ করল। কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ 'রেসিডেন্ট' রাখার ব্যবস্থা হল। এইভাবে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী ভারতের সার্বভৌম এবং সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যের অধিকারী বলে স্বীকৃতি-লাভ করল।

॥ **১৮২৩-১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার** ॥ ১৮২৩ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আমহার্স্ট, উইলিয়ম বেণ্টিক, চার্লস মেটকাফ, অকল্যাণ্ড, এলেনবরা, হার্ডিঞ্জ পর পর শাসনকর্তা হয়েছিলেন। আমহার্স্টের শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের (১৮২৪-২৬ খ্রীঃ) ফলে ব্রহ্মদেশের উপকূলের অধিকাংশ ইংরেজ অধিকারে আসে এবং আসাম, কাছাড় ও মণিপুর বলতে গেলে ইংরেজদের রক্ষণাধীন রাজ্যে পরিণত হল। বেণ্টিঙ্কের আমলে (১৮২৮-৩৫) কাছাড় ও কুর্গ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ইতিমধ্যে পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের নেতৃত্বে অখণ্ড শিখরাজ্যের অভ্যুত্থান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে বিব্রত করে তুলেছিল। বেন্টিক রণজিৎ সিংহের সঙ্গে এবং সিন্ধুদেশের আমীরদের সঙ্গে সন্ধি করে ঐ সব স্থানে ব্রিটিশ বাণিজ্যের সুবিধে লাভ করেন। অকল্যাণ্ডের শাসনকালে (১৮৩৬-৪২) প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী কাবুল, কান্দাহার ও গজনী অধিকার করে। এলেনবরার আমলে (১৮৪২-৪৪ খ্রীঃ) পুনরায় ইংরেজবাহিনী বিদ্রোহী আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযান করে। গজনী বিধ্বস্ত করা হয়। ইংরেজ বাহিনী সিন্ধুদেশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের শাসনকালের (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) প্রধান ঘটনা হল প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ)। রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখরাজ্যে বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইংরেজরা এই যুদ্ধ শুরু করে। বিজয়ী হয়ে ইংরেজরা লাভ করে বিপাশা ও শতদ্রুর মধ্যবর্তী জলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর বামপাশের শিখ রাজ্যাংশ।

॥ **ডালহৌসীর শাসনকালে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার** (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ)॥ লর্ড ডালহৌসী ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। যুদ্ধ, স্বত্ববিলোপ নীতি এবং অন্যান্য উপায়ে ব্রিটিশ অধিকার বিস্তৃত করেছিলেন তিনি।

দ্বিতীয় শিখযুদ্ধে (১৮৪৮-৪৯) জয়লাভ করে তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধে (১৮৫২ খ্রীঃ) জয়লাভ করে তিনি রেঙ্গুন, প্রোম ও পেগু প্রদেশ অধিকার করে দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত জয় করেন।

ডালহৌসী 'স্বত্ববিলোপ নীতি' নামে এক অভিনব নীতি অনুসরণ করেন। এই নীতি অনুসারে তিনি ঘোষণা করেন যে, ইংরেজদের অধীন, আশ্রিত বা সৃষ্ট কোন দেশীয় রাজার অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হলে তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করবে। কোন দত্তক-পুত্রের উত্তরাধিকারের দাবি স্বীকৃত হবে না। এই নীতি অনুসারে সাতারা, ঝাঁন্সি, নাগপুর ও অন্যান্য কয়েকটি রাজ্য ব্রিটিশ সরকার বাজেয়াপ্ত করে। কর্ণাটকের নবাব ও তাঞ্জোরের রাজার দত্তক-পুত্রের বৃত্তি বন্ধ করা হল এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তক-পুত্র নানাসাহেব বৃত্তি থেকে বঞ্চিত হন।

স্বত্ববিলোপ নীতি ছাড়াও নানান উপায়ে ডালহৌসী বিভিন্ন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার (মহাবিদ্রোহ পর্যন্ত)
১৭৮৫ খ্রীঃ ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল
১৭৮৫-১৮০৫ পর্যন্ত ,, ,,
১৮০৫-১৮১৯ ,, ,, ,,
১৮১৯-১৮৫৮ ,, ,, ,,
গিলগিট ১৮৯৫
কাশ্মীর ১৮৪৬
পাঞ্জাব ১৮৪৯
বেলুচিস্তান
১৮১৫
১৮০১
রাজপুতানা ১৮১৮
১৮০৩
১৮১৮
অযোধ্যা ১৮৫৬
১৮০১
বিহার ১৭৬৫
আসাম ১৮২৬
সিন্ধু ১৮৪৩
১৮১২
মালব ১৮১৮
বাংলা ১৭৬৫
কলিকাতা ১৬৯০
১৮০৩-৭
মারাঠা
বেরার ১৮৫৩
ভোঁসলে
উড়িষ্যা ১৮০৩
সুরাট ১৬১২
বোম্বাই ১৬৬৮
নিজামের রাজ্য ১৮০০
হায়দ্রাবাদ
সরকার ১৭৬৬
মসুলিপট্টম ১৬২০
কুর্নুল ১৮৩৯
মহীশূর ১৮৩১
মাদ্রাজ ১৬৩৯
ত্রিবাঙ্কুর ১৭৮৮
সিংহল ১৭৯৫

রাজ্য অধিকার করেছিলেন। কুশাসনের অভিযোগে অযোধ্যার নবাব ওয়াজেদ আলিকে তিনি রাজ্যচ্যুত করেন এবং অযোধ্যা ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ব্রিটিশ কর্মচারীর প্রতি অভদ্র আচরণের অজুহাতে সিকিমের কিয়দংশ কেড়ে নেওয়া হয়। ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য হায়দ্রাবাদের নিজাম বেরার প্রদেশ ইংরেজের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। এইভাবে ডালহৌসী ভারতে এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী নীতি দেশীয় রাজাদের মধ্যে ভীতি ও তীব্র অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল এবং তাঁর এই নীতি সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ।

॥ সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭) ॥

লর্ড ডালহৌসির পর ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড ক্যানিং। তাঁর শাসনকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ব্রিটিশ ঐতিহাসিকরা যাকে বলেছেন 'সিপাহী বিদ্রোহ'। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এই বিদ্রোহের আকার ও বিস্তৃতির নিরিখে ভারতীয় ঐতিহাসিকরা একে মহাবিদ্রোহ আখ্যা দিয়াছেন।

॥ বিদ্রোহের কারণ ॥ হঠাৎ একদিনে বা কোন একটি বিশেষ কারণে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে নি। দীর্ঘকাল থেকে তাদের ও জনগণের অভিযোগ ও অসন্তোষ এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এই বিদ্রোহের পেছনে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় এবং সামরিক কারণ ছিল।

রাজনৈতিক : রাজনৈতিক কারণগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ডালহৌসীর স্বত্ববিলোপ নীতি। এই নীতির প্রয়োগে বহু রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অনেক রাজার দত্তকপুত্রের বৃত্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। দিল্লীর মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে দিল্লীর বাইরে অপসারণ করলে হিন্দু-মুসলমান ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে; আবার পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও-এর দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তি বন্ধ করায় হিন্দুরা অপমানিত বোধ করে। ঝাঁন্সির রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গেলে রাজ্যটি ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়। ফলে এই বিক্ষুব্ধ রাজা ও নবাবরা প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজতে থাকেন।

অর্থনৈতিক : এই মহাবিদ্রোহের পিছনে অর্থনৈতিক কারণও

ছিল। কৃষকদের ওপর অতিরিক্ত কর ধার্য, রাজস্ব বৃদ্ধি, প্রাচীন জমিদার পরিবারগুলির ধ্বংস ও বেকারত্ব ইত্যাদি কারণে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। এছাড়া, বিলাতী পণ্যদ্রব্যের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পগুলি হটে যায়। এতেও বহুলোক বেকার হয়ে যায়। দেশীয় সিপাহীদের বেতন গোরা সৈনিকদের তুলনায় ছিল অত্যন্ত কম।

সামাজিক ও ধর্মীয় : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার, সতীদাহ প্রথা নিবারণ, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, খ্রীষ্টধর্মের উগ্র প্রচার ও ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা ইত্যাদি ভারতীয়দের চোখে ছিল তাদের জাতি-ধর্ম নাশের প্রয়াস। এমন কি রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফকে তারা মনে করত ঈশ্বরবিরোধী শয়তানের যন্ত্র!

সামরিক : দেশীয় সিপাহীদের বেতনই কম ছিল না, স্বধর্ম-চ্যুতির আশঙ্কাও ছিল। তারা ছিল অধিকাংশই উচ্চ বর্ণের হিন্দু। ব্রহ্মযুদ্ধে ও আফগানিস্থানের যুদ্ধে তাদের সমুদ্র অতিক্রম করতে হয়েছিল ; কিন্তু তারা সমুদ্রযাত্রাকে মহাপাপ মনে করত। তবু লর্ড ক্যানিং একটি আইন করে দেশীয় সিপাহীদের ভারতের বাইরে যে-কোন স্থানে গমন বাধ্যতামূলক করেন।

এই পরিস্থিতিতে ভারত যখন বিস্ফোরণের মুখে তখন 'এনফিল্ড রাইফেল' নামে এক ধরনের বন্দুক প্রবর্তিত হয়। এর টোটা দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকের নলে ঢোকাতে হত। কিন্তু এই টোটাতে গরু ও শূকরের চর্বি মেশানো আছে—এই কথা রটে যায়। খাদ্য হিসেবে গরু হিন্দুদের, শূকর মুসলমানদের নিষিদ্ধ। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান সিপাহীরা উত্তেজিত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করল।

॥ বিদ্রোহের বিস্তার ও দমন ॥ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের ব্যারাকপুর ও বহরমপুরে প্রথমে বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। এরপর মে মাসে উত্তর প্রদেশে মীরাটে বন্দী সহকর্মীদের জেলখানা ভেঙে মুক্ত করে সিপাহীরা দিল্লী অধিকার করে এবং অতিবৃদ্ধ মুঘল বাদশাহ্ বাহাদুর শাহকে 'ভারতের সম্রাট' বলে ঘোষণা করে। কানপুর, লক্ষ্ণৌ ও মধ্যভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। বিঠূরের নানাসাহেব নিজেকে পেশোয়া ঘোষণা করে বিদ্রোহে

যোগদান করেন। ঝাঁন্সির রাজ্যচ্যুত রানী লক্ষ্মীবাই বিদ্রোহে যোগ দিলেন—পুরুষের বেশে তিনি যুদ্ধ করতে থাকেন।

স্থানে স্থানে বিদ্রোহ তীব্র হলেও এক বছরের বেশী এই বিদ্রোহ স্থায়ী হয় নি। নানাসাহেব নেপালে আত্মগোপন করেন। তাঁর সেনাপতি তাঁতিয়া টোপীর ফাঁসি হয়। কুনওয়ার সিং-এর মৃত্যুর পর বিহারের বিদ্রোহ দমিত হয়। ঝাঁন্সির রানী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দেন। মুঘল রাজকুমারদের হত্যা করা হয়। বাহাদুর শাহ্কে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

॥ বিদ্রোহের প্রকৃতি ॥ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে তীব্র মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন যে, সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসেবে শুরু হলেও এটি ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে পর্যবসিত হয় এবং পরবর্তী স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা এর থেকে উৎসাহ-উদ্দীপনা লাভ করেছেন। ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা এটিকে বলেছেন মূলতঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ। একে স্বার্থসন্ধানী নেতাদের জরাজীর্ণ সামন্ততন্ত্রকে চাঙ্গা করার চেষ্টা বলা যায়। নানাসাহেব চেয়েছিলেন পেশোয়া হতে। বাহাদুর শাহ্ চেয়েছিলেন মুঘল সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে। আবার লক্ষ্মীবাই যুদ্ধ করেছিলেন শুধু "মেরি ঝাঁন্সির" জন্য। অযোধ্যার তালুকদাররা ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, কেননা সামন্ত-তন্ত্রের মূলে ইংরেজরা আঘাত করেছিল। হিন্দু-মুসলমানরা অস্ত্র ধরেছিল নিজেদের জাতি-ধর্ম রক্ষার জন্য। সুতরাং বিদ্রোহীদের ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থ ছিল এবং ভারতবর্ষের একটি অখণ্ড রূপ তাদের মনে ছিল না। বিদ্রোহীরা ভারতবর্ষে সামন্ততন্ত্র ও অন্ধ সংস্কার জীইয়ে রাখার জন্য সংকল্প নিয়েছিল। সুতরাং এটি ইংরেজদের বিরুদ্ধে একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু ঐতিহাসিক ড. সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেছেন যে, এই বিদ্রোহ শুধুমাত্র সিপাহীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। কোন কোন জায়গায় সর্বস্তরের মানুষ সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করেছিল। স্থানে স্থানে বিদ্রোহ জাতীয় আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য লাভ করেছিল।

॥ বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ ॥ প্রথম থেকেই মহাবিদ্রোহের

ব্যর্থতা ছিল অবধারিত। এর পেছনে কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছিল না। তাই এই বিদ্রোহ বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছিল। সুতরাং সংহতির অভাবের জন্য ইংরেজদের পক্ষে বিদ্রোহটিকে দমন করা সহজ হয়েছিল।

সর্বশেষে বলা যায়, দেশীয় সিপাহীরা প্রাচীন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লড়েছিল কিন্তু ইংরেজদের ছিল উন্নত অস্ত্রশস্ত্র। টেলিগ্রাফ, রেলপথ ইত্যাদি যোগাযোগের আধুনিক ব্যবস্থাগুলি ইংরেজদের হাতে থাকায় শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়েছিল।

॥ কোম্পানীর আমলে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল ॥

পলাশীর যুদ্ধ থেকে সিপাহী বিদ্রোহ (১৭৫৭-১৮৫৭ খ্রীঃ) পর্যন্ত একশো বছর 'কোম্পানীর আমল' নামে পরিচিত।

রাজনৈতিক অসন্তোষ ঃ ভারতীয় জনগণ বিনা প্রতিবাদে কোম্পানীর শাসন মেনে নেয় নি। তাই বিভিন্ন অঞ্চলে খণ্ড খণ্ড গণবিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এদিকে বিশেষতঃ বাংলাদেশে নব্যশিক্ষিত শ্রেণী দেশশাসন ব্যাপারে কিছুটা অধিকার দাবি করতে থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন সভাসমিতি গড়ে তুলছিলেন। এগুলির মাধ্যমে ও পত্রপত্রিকায় ইংরেজদের কুশাসন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছিল।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ ঃ ভারতীয় জনগণের অসন্তোষের মূলে ছিল ব্রিটিশদের নির্লজ্জ অর্থনৈতিক শোষণ। কোম্পানীর শাসনে ভারতের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে যায়। ইংল্যাণ্ডে তৈরি মালপত্রে বাজার ছেয়ে যায়। ভারতীয় কুটিরশিল্পজাত মালপত্রের দাম বেশী হওয়ায় কুটিরশিল্পের ধ্বংস হল। ফলে ধ্বংস হল গ্রামীণ অর্থনীতিও। অসংখ্য লোক বেকার হল। জমির ওপর চাপ বেড়ে গেল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে ইংরেজদের প্রতি অনুগত এক জমিদারশ্রেণীর সৃষ্টি হল। অত্যধিক খাজনার চাপে কৃষকরা জর্জরিত হতে থাকল। মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগল। তারা দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হতে থাকল অথচ কোম্পানী ও তার ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা অবৈধ উপায়ে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ নিজ দেশে পাঠাতে থাকে। ভারতকে রিক্ত করে নিঃস্ব ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা বনে যেতে লাগল "ভারতীয় নবাব।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর পৃথিবী —বিপ্লবের যুগ

'রেনেশাঁস' (নবজাগরণ), 'রিফরমেশন' (ধর্মসংস্কার আন্দোলন) ও 'রেভলিউশন' (বিপ্লব)—এই তিনটি আলোড়নকারী ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্তমান যুগের জন্ম। তোমরা জেনেছ 'রেনেশাঁস' 'যুক্তিবাদী যুগের' গোড়াপত্তন করেছিল, আর 'রেনেশাঁসে'র সূত্র ধরেই দেখা দিয়েছিল 'রিফরমেশন'। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ঐ যুক্তিবাদের পথ ধরেই এল 'বিপ্লবের যুগ'। সবশুদ্ধ তিনটি বিপ্লব সামন্ততন্ত্রের জরাজীর্ণ সৌধটিকে ভেঙে চুরমার করে দিল। বিপ্লব তিনটি হল,— আমেরিকার বিপ্লব, শিল্প বিপ্লব ও ফরাসী বিপ্লব।

[ক] আমেরিকার বিপ্লব বা আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ঃ

সতের শতকে ইংল্যাণ্ডের স্টুয়ার্ট রাজাদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে ক্ষুব্ধ হয়ে বহু ইংরেজ মাতৃভূমি ছেড়ে আমেরিকায় স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে থাকে। অনেকে আবার ভূ-সম্পত্তি ও সোনার খনির লোভে সেখানে বাস করতে আসে। এইভাবে ধীরে ধীরে আমেরিকায় ইংরেজদের তেরটি উপনিবেশ গড়ে ওঠে।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের কারণ ঃ আমেরিকাবাসীরা জাতিতে ইংরেজ হলেও ইংল্যাণ্ড থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল দূরে থাকায় তাদের মধ্যে একটি স্বাতন্ত্র্যবোধ জেগেছিল। স্বদেশবাসীর অধীনতা তাদের একেবারেই ভাল লাগত না। আভ্যন্তরীণ শাসনে তারা কিছুটা স্বায়ত্তশাসন ভোগ করত। ধীরে ধীরে এই দুঃসাহসী ও উদ্যমী আমেরিকাবাসীরা পূর্ণ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতে থাকে।

বাণিজ্যের ব্যাপারে ঔপনিবেশিকরা নানা নিয়ম-নিষেধের সম্মুখীন হত। যে সব জিনিস ইংল্যাণ্ডে উৎপন্ন হত না সেগুলি তারা কেবল ইংল্যাণ্ডেই চালান দিতে পারতো। আবার ইংল্যাণ্ডে যে সব পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হত, সেগুলি তারা উৎপাদন করতে পেত না। আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য ইংল্যাণ্ডের মারফত করতে বাধ্য হত।

এক কথায়, ইংল্যাণ্ড চালাত অর্থনৈতিক শোষণ। তবু তারা দুটি কারণে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে দাঁড়াত না। এক, এইসব নিয়ম-নিষেধ ইংরেজরা কঠোরভাবে প্রয়োগ করত না। দুই, কানাডা ছিল ফরাসী উপনিবেশ। সুতরাং সেখান থেকে ফরাসীরা আক্রমণ করলে ইংরেজরা ছাড়া তাদের কেউ রক্ষাকর্তা ছিল না।

কিন্তু সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে কানাডায় ফরাসী আধিপত্যের অবসান হল। ঔপনিবেশিকদের ফরাসী-ভীতি আর রইল না। সুতরাং ইংল্যাণ্ডের প্রতি তাদের আনুগত্য দিন দিন কমতে থাকল।

ঠিক এই সময় সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩) ইংল্যাণ্ডের যে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছে তার একটা অংশ আমেরিকাবাসীদের কাছ থেকে আদায় করতে চাইল ইংরেজরা। তাই 'স্ট্যাম্প আইন' (১৭৬৫) পাস করে ইংল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট বলল—আমেরিকার সরকারী কাজে ব্যবহৃত সমস্ত দলিলপত্রে ইংল্যাণ্ড থেকে কেনা স্ট্যাম্প ব্যবহার করতেই হবে। এর বিরুদ্ধে আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন হল। তারা আওয়াজ তুল্‌লো—পার্লামেণ্টে "প্রতিনিধিত্ব ছাড়া ট্যাক্স নাই"। প্রবল প্রতিবাদে ইংরেজ সরকার 'স্ট্যাম্প আইন' প্রত্যাহার করে নিল। কিন্তু ইংরেজ সরকার ঘোষণা করল যে ঔপনিবেশিকদের ওপর করধার্যের অধিকার ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের আছে। কিছুকালের মধ্যেই ইংরেজ সরকার চা, কাঁচ ও কাগজের আমদানির ওপর করধার্য করল। আবার প্রবল আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার চা ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জিনিসের ওপর থেকে কর তুলে নিল।

তবু ঔপনিবেশিকরা শান্ত হল না। অবশেষে বোস্টন বন্দরে চা বোঝাই একটি জাহাজ পৌঁছুলে কয়েকজন আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের ছদ্মবেশে সমস্ত চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দিল। এই ঘটনা 'বোস্টন টি পার্টি' বলে খ্যাত। এই অপরাধে ইংরেজ সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিল এবং ম্যাসাচুসেটস্ উপনিবেশের স্বায়ত্ত-শাসন কেড়ে নিল।

ঔপনিবেশিকদের বিক্ষোভ বাড়তেই থাকল। স্বাধীনতাকামী

উপনিবেশগুলি ফিলাডেলফিয়ায় মিলিত হল (১৭৭৪ খ্রীঃ)। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে লেক্সিংটনে ইংরেজ সৈন্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষ হল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এক মূল্যবান দলিল রচনা করে ঔপনিবেশিকরা জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-যুদ্ধ ঘোষণা করল। এই দলিলের মূলকথা ঃ সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে সমস্ত মানুষ।'

জর্জ ওয়াশিংটন

ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের কারণ ঃ ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই সন্ধি অনুসারে পরাজিত ইংরেজরা উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। ঔপনিবেশিকদের ইংরেজদের মত নৌবল ছিল না, ছিল না উন্নত অস্ত্রশস্ত্র। তবু তারা জয়লাভ করেছিল। এই সাফল্যের পেছনে কতকগুলি কারণ আছে।

প্রথমতঃ, গর্বিত ইংরেজ সরকার ঔপনিবেশিকদের শক্তিসামর্থ্যকে তাচ্ছিল্য করেছিল। ফলে যুদ্ধ পরিচালনায় তারা যত্নবান হয় নি। তাদের নানান সামরিক ভুলত্রুটি ঘটেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডের দূরত্ব প্রায় তিন হাজার মাইল। সেকালে পালতোলা জাহাজই ছিল যোগাযোগের একমাত্র উপায়। সুতরাং অতদূরে সৈন্য ও রসদ জোগানো ইংল্যাণ্ডের পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল।

তৃতীয়তঃ, ঔপনিবেশিকরা বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল। ইংরেজদের শত্রু ফরাসীরা ঔপনিবেশিকদের অর্থ ও সৈন্য দিয়ে সাহায্য করে। স্পেন এবং হল্যাণ্ডও ঔপনিবেশিকদের পক্ষ নেয়।

চতুর্থতঃ, আমেরিকান সেনাপতি জর্জ ওয়াশিংটনের দুর্জয় সাহস, অসাধারণ রণকুশলতা ও সুযোগ্য নেতৃত্ব ঔপনিবেশিকদের সাফল্যের অন্যতম কারণ। তিনি দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ সঞ্চারিত

করেছিলেন। তাই তারা জীবনপণ করে যুদ্ধ করেছে
কারণে তারা জয়লাভ করেছিল।

ফলাফল : আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ফলা
ব্যাপক যে অনেকে এটিকে 'আমেরিকার বিপ্লব' আখ্যা দি
আজ যে আমরা দেখি আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির অন্যতম তার প্রথম পদক্ষেপ ছিল এই বিপ্লব। বিপ্লবের ফলে আমেরিকার উপনিবেশগুলি প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠে। সুতরাং ইউরোপের সর্বত্র রাজতান্ত্রিক আদর্শের জায়গায় প্রথম প্রজাতান্ত্রিক আদর্শ স্থাপন সত্যিই ছিল একটি বৈপ্লবিক ব্যবস্থা।

এর ফলে ইংরেজরা বুঝতে পেরেছিল যে, তাদের শোষণমূলক ঔপনিবেশিক নীতি কত অসার। তাই তারা স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে উদার ঔপনিবেশিক নীতি গ্রহণ করে।

আমেরিকার বিপ্লব সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছিল ফ্রান্স দেশকে। সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে গিয়ে ফ্রান্স ঔপনিবেশিকদের প্রচুর অর্থসাহায্য করেছিল। এর ফলে ফ্রান্স দেউলে হয়ে ফরাসী বিপ্লবের দিকে এগোতে থাকে। আবার, আমেরিকার যুদ্ধে বহু ফরাসী যোগদান করে। তারা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়। এর ফলেও ফরাসী বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়েছিল।

[খ] ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লব

আঠারো শতকে প্রথমে ইংল্যাণ্ডে ও পরে ইউরোপের অন্যান্য জায়গায় বিজ্ঞানের কল্যাণে উৎপাদন ব্যবস্থা ও জীবনযাত্রা প্রণালীতে যে আমূল পরিবর্তন ঘটে তাকে শিল্প বিপ্লব বলে। নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের ফলে কৃষি ও শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগত মান বেড়ে যায়। অন্যান্য বিপ্লবের মত এই বিপ্লব আকস্মিক ও চমকপ্রদ নয়। আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে ধীর গতিতে এর প্রসার ঘটতে থাকে।

ইংল্যাণ্ডে এই বিপ্লব প্রথম দেখা দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ড তার উপনিবেশগুলি বিশেষতঃ ভারতবর্ষ থেকে প্রচুর অর্থ নিয়ে যেত, নিয়ে যেত প্রচুর কাঁচামাল। আবার এসমস্ত জায়গাতেই সে তার

পণ্য বিক্রি করত। অর্থাৎ শিল্প বিপ্লবের প্রারম্ভে প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, মূলধন ও পণ্যের বাজারের অভাব ছিল না ইংল্যাণ্ডের। তার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল উন্নত, সুলভে শ্রমিকও পাওয়া যেত।

কৃষিতে বিপ্লব ঃ আঠারো শতকের আগে পর পর দু' বছর চাষের পর কৃষিজমি তার উর্বরা শক্তি ফিরে পাবার জন্য একবছর পতিত রাখা হত। কোন ভাল সার দেবার পদ্ধতিও জানা ছিল না। প্রথম জর্জের মন্ত্রী টাউনসেণ্ড আবিষ্কার করলেন যে শালগমের মত মূলজাতীয় শস্যের চাষ করলে জমির উর্বরতা বজায় থাকে আর অতিরিক্ত ফসলও পাওয়া যায়। এরপর দেখা যায় যে, শস্যাবর্তন করলে ফলন বাড়ে।

জেথ্রো টাল উন্নত ধরনের বীজ বপনের পদ্ধতি চালু করেন। এই সময়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়।

পশুপালনের পদ্ধতিরও উন্নতি ঘটে। আগে খাদ্যের অভাবে শীতের আগে অধিকাংশ গৃহপালিত পশু বধ করা হত। কিন্তু শস্যের ফলন বেড়ে যাওয়ায় তাদের বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়। এই সময় রবার্ট বেকওয়েল প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের চেষ্টায় বিভিন্ন গৃহপালিত পশুর মধ্যে শংকর ঘটিয়ে উন্নত শ্রেণীর গরু-মোষ সৃষ্টি হয়।

কৃষিশিল্পে এই বিপ্লবের ফলে বহু পতিত জমি আবাদযোগ্য হয়। ফলন বাড়ে। বহু খামার গড়ে ওঠে। চাষবাস ঝুঁকি ও ব্যয়বহুল হওয়ায় ধনী জমিদারদের সুবিধে হল। দরিদ্র চাষীর পক্ষে চাষবাস চালানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যান্য আবিষ্কারসমূহ ঃ ইংল্যাণ্ডে সবার আগে শিল্প বিপ্লব ঘটে নানান যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের মাধ্যমে।

বয়ন শিল্পের ক্ষেত্রে জন কে 'উড়ন্ত মাকু' নামে এক উন্নত মাকু আবিষ্কার করেন (১৭৩৮ খ্রীঃ)। হারগ্রীভস্ আবিষ্কার করেন 'স্পিনিং জেনী', যার দ্বারা একসঙ্গে আটগাছি সুতো কাটা যেত। আর্করাইট আবিষ্কার করেন 'ওয়াটার ফ্রেম' নামে জল-শক্তি চালিত কাপড় বোনার যন্ত্র। ক্রম্পটন-আবিষ্কৃত 'মিউল' নামে সুতো কাটার যন্ত্র ও কার্টরাইট-আবিষ্কৃত 'পাওয়ার লুম' বস্ত্র উৎপাদনে

প্রভূত উন্নতি ঘটিয়েছিল। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ওয়াট যুগান্তকারী আবিষ্কার করলেন—বাষ্পীয় ইঞ্জিন। জল-শক্তির জায়গায় বাষ্প শক্তি উৎপাদনে আমূল পরিবর্তন আনল।

জেমস্ ওয়াট

কয়লা ও লৌহ শিল্পের ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এল —হামফ্রে ডেভি খনির নিচে নিরাপদে কাজ করার জন্যে 'সেফ্‌টি ল্যাম্প' আবিষ্কার করলেন। প্রচুর কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব হল। আবার কাঠকয়লার পরিবর্তে কয়লার আগুনে লৌহপিণ্ড গলানো আরম্ভ হল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে **জন স্মীটন** লৌহ গলানোর জন্য 'ব্লাস্ট ফার্নেস' বা চুল্লী আবিষ্কার করেন। ফলে লৌহ-নির্মিত জাহাজ প্রস্তুত হতে লাগল।

যানবাহনের ক্ষেত্রেও বিরাট পরিবর্তন এল। **টেলফোর্ড ও ম্যাকাডেমের** 'পিচের রাস্তা' তৈরির কৌশল, **জর্জ স্টিভেনসনের** 'বাষ্পচালিত রেল ইঞ্জিন' আবিষ্কার এবং **ফুলটনের** 'বাষ্পচালিত জাহাজ নির্মাণ' এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এরপর খাল ও ক্যানেল খনন করা হয়। বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগ এবং টেলিগ্রাফ, টেলিফোন ইত্যাদির আবিষ্কারের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি ঘটে।

জর্জ স্টিভেনসন

শিল্প বিপ্লবের ফলাফল: শিল্প বিপ্লব একটি যুগান্তকারী

ঘটনা। এই বিপ্লব সমকালীন অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতিতে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিল। মানব সভ্যতায় এর প্রভাব আজও রয়েছে। আজও যন্ত্রে তৈরি শিল্পদ্রব্য আমাদের জীবনকে আরাম-প্রদ করছে। আজকের সভ্যতাকে তাই আমরা 'শিল্পাশ্রয়ী সভ্যতা' বলতে পারি। এর ফলাফলগুলিকে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগে ভাগ করা যায়।

অর্থনৈতিক ঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শিল্পবিপ্লব নানান পরিবর্তন এনেছিল। যান্ত্রিক উৎপাদনের ফলে অল্প সময়ে প্রচুর পরিমাণে শিল্প-দ্রব্য প্রস্তুত হতে লাগল। ফলে বাণিজ্যের উন্নতি হল। ইংল্যাণ্ড সমগ্র "বিশ্বের কারখানায়" পরিণত হল। তার জাতীয় সম্পদ বাড়তে থাকল। এছাড়া প্রচুর ভোগ্যপণ্য উৎপন্ন হওয়ায় জীবনযাত্রার মানের উন্নতি ঘটে। আবার উৎপাদনের কেন্দ্রগুলিতে নতুন নতুন শহর গড়ে উঠতে থাকে। বড় বড় ফ্যাক্টরীকে কেন্দ্র করে ধনতান্ত্রিক শিল্প ব্যবস্থা এবং একটি নতুন পুঁজিবাদী শ্রেণী গড়ে ওঠে।

সামাজিক ঃ শিল্প বিপ্লবের ফলে গ্রামীণ সমাজ ভেঙে পড়তে থাকে। গ্রাম থেকে শ্রমিকেরা কাজের সন্ধানে শহরের কারখানায় আসতে থাকে। ফলে কৃষির অবনতি ঘটে। গ্রামগুলি ক্রমশঃ জনহীন হয়ে পড়তে থাকে। এছাড়া, গ্রামে যারা কুটির শিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত তারা যন্ত্রশিল্পের সঙ্গে প্রতিযেগিতায় হেরে গেল। তারা স্বাধীন জীবিকা ছেড়ে শ্রমিকে পরিণত হল।

যেসব জায়গায় কারখানা গড়ে ওঠে সেখানে সমাজ দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়—ধনী ও দরিদ্র, মালিক ও শ্রমিক। শিশু ও স্ত্রীলোকদের শ্রমিক হিসেবে নিয়োগ, কারখানার অস্বাস্থ্যকর এলাকায় বসবাস ইত্যাদির জন্যে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ও নৈতিক মানের অবনতি ঘটল।

রাজনৈতিক ঃ মূলধনী মালিকশ্রেণীর মুনাফা বাড়তে থাকল এবং অর্থের জোরে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতারও মালিক হয়ে বসল। অপরদিকে শ্রমিকদের অসন্তোষ বাড়তেই থাকল। তাদের মজুরি কম, কাজের সময় নির্দিষ্ট নয়, চাকরির মেয়াদ মালিকের ইচ্ছের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং শ্রমিকরা পার্লামেণ্টে তাদের প্রতিনিধি

পাঠানোর অধিকার দাবি করল যাতে তাদের স্বার্থে আইন রচিত হয়। এই 'চার্টিস্ট আন্দোলনের' ফলে শ্রমিকরা ভোটাধিকার ও প্রতিনিধি পাঠানোর অধিকার পায়।

[গ] ফরাসী বিপ্লব

সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা—আমাদের অতি-পরিচিত শব্দ তিনটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত যে ঘটনার সঙ্গে তার নাম 'ফরাসী বিপ্লব'। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে এই বিপ্লবের সূচনা।

ফ্রান্সে বিপ্লবপূর্ব চিন্তাধারা ঃ অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূত্রপাত হয়েছিল। এই নব-যুগের প্রবর্তক দার্শনিকরা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের রেনেশাঁসের উত্তরসাধক। এঁরা সেকালের ঘুন-ধরা সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্মব্যবস্থার দোষ-ত্রুটির সমালোচনা করে এগুলির পুনর্গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—মণ্টেস্কু, ভল্‌টেয়ার ও রুশো।

মণ্টেস্কু ঃ মণ্টেস্কু পেশায় ছিলেন উকিল কিন্তু রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ হিসেবে তাঁর যশ-খ্যাতি। তিনি তাঁর 'পার্সিয়ান লেটার্স' বইয়ে পরিহাসের ছলে ফরাসী অভিজাত সমাজের অন্যায় ও রাজপরিবার ও রাজসভার দুর্নীতির কথা বলেছেন। তাঁর বিখ্যাত বই 'স্পিরিট অব্‌ দি লজ'-এ বলেছেন যে শাসন-আইন-বিচার বিভাগীয় ক্ষমতা একজনের হাতে থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিপন্ন হয়, সেজন্য তিনটি বিভাগের ক্ষমতার পৃথকীকরণ দরকার। ইংল্যাণ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রই হল তাঁর মতে শ্রেষ্ঠ শাসনব্যবস্থা।

ভল্‌টেয়ার ঃ এ যুগের সবচেয়ে যুক্তিবাদী দার্শনিক ছিলেন ভল্‌টেয়ার। সমাজ ও ধর্মব্যবস্থায় যে সমস্ত অনাচার আর অসাম্য প্রবেশ করেছিল সেগুলিকে তিনি প্রচণ্ড বিদ্রূপ করেছেন। অবশ্য সবচেয়ে জোরালো সমালোচনা করেছিলেন চার্চের কুসংস্কার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে। প্রতিটি মানুষের জন্য তিনি দাবি করেছিলেন চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা। তিনি মনে করতেন যে রাজতন্ত্র বজায় রেখেই ফ্রান্সের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটা সম্ভব।

রুশো ঃ জনপ্রিয়তায় সমস্ত চিন্তাবিদ্‌দের ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন জাঁ জ্যাক রুশো। তিনি রাজসভা ও চার্চের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ

চালিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, 'মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছিল কিন্তু সর্বত্র সে শৃঙ্খলে আবদ্ধ।' কিছু স্বার্থপর মানুষের জন্য সমাজে সকলে এই স্বাধীনতা ও সমান অধিকার ভোগ করতে পায় না। তাঁর বিখ্যাত বই 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট'। এতে তিনি বলেছেন, জনসাধারণের সঙ্গে রাজার চুক্তির ফলেই রাষ্ট্রের সৃষ্টি, জনসাধারণই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। শাসককে 'জনগণের ইচ্ছা' অনুযায়ী শাসন চালাতে হবে, নইলে জনগণ তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারে।

রুশো

ফরাসী বিপ্লবের কারণ ঃ একদিনে, একটি মাত্র কারণে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় নি। এর পেছনে ছিল ফরাসীদের দীর্ঘকালের অভাব, অভিযোগ ও অসন্তোষ। কারণগুলিকে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও দার্শনিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

রাজনৈতিক ঃ ফ্রান্সে রাজতন্ত্র ছিল স্বৈরাচারী ও দৈবস্বত্বে বিশ্বাসী রাজা ছিলেন সমস্ত ক্ষমতার মালিক। জনগণের স্বাধীনতা ছিল না। অভিজাতরা কারও বিরুদ্ধে 'লেতরী-দ্য-কেশে' বলে এক গ্রেপ্তারী পরোয়ানায় রাজাকে দিয়ে সই করিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করত এবং বিনা বিচারে আটকে রাখত। বিচারের নামে প্রহসন হত। বিচারকরা ছিলেন দুর্নীতিপরায়ণ। যাঁর রাজত্বকালে ফরাসী বিপ্লব দেখা দেয় বুর্বোঁ বংশীয় সেই ষোড়শ লুই ছিলেন খুব ভাল লোক কিন্তু অপদার্থ শাসক। তাঁর স্ত্রী মারি আঁতোয়ানেৎ ছিলেন অহঙ্কারী ও অত্যন্ত বিলাসপ্রিয়া। অভিজাত শ্রেণী ও রানীর প্রভাবে রাজা জনগণের মঙ্গলের জন্য কোন সংস্কার করতে পারেন নি। রাজার সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল তাঁর রাজকোষ অর্থশূন্য হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পূর্বপুরুষ রাজাদের ক্রমাগত যুদ্ধ ও বিলাসব্যসনের ফলে এই আর্থিক দুর্গতি দেখা দিয়েছিল।

সামাজিক ঃ সমাজে অসাম্য ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ। 'সুযোগ-সুবিধে প্রাপ্ত ও সুযোগ-সুবিধে হীন'—এই দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল ফ্রান্সের সমাজ। যাজক সম্প্রদায় বা 'প্রথম সম্প্রদায়' এবং অভিজাত বা 'দ্বিতীয় সম্প্রদায়' ছিল 'সুযোগ-সুবিধে প্রাপ্ত' শ্রেণী। অভিজাত বা সামন্তপ্রভুরা ছিল সমাজের মাথা, এদের হাতেই ছিল টাকা-পয়সা আর বিস্তর জমি-জমা। বড় বড় চাকরিতে ছিল এদের একচেটে অধিকার। যাজকদের পারলৌকিক চিন্তার চেয়ে পার্থিব সুখের প্রতি লালসা ছিল অনেক বেশী। মজার ব্যাপার, তাদের কোন ট্যাক্স দিতে হত না।

জনসংখ্যার শতকরা আটানব্বুই ভাগেরও কিছু বেশী মানুষ ছিল 'সুযোগ-সুবিধেহীন' সম্প্রদায়। এদের বলা হত তৃতীয় সম্প্রদায়। এরা গঠিত ছিল উচ্চ-মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিকদের নিয়ে। তারা সামাজিক ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত, অথচ ট্যাক্সের বোঝা বহন করত তারাই।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের উচ্চস্তরে ছিল উচ্চ মধ্যবিত্তরা। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তাদের হাতে ছিল টাকা। বিদ্যাবুদ্ধিতে ছিল তারা সকলের চেয়ে বড়। কেবল তাদের ছিল না জন্মকৌলিন্য। এরা মনে-প্রাণে অনুভব করত, সামাজিক সম্মান ও স্বীকৃতি তাদেরও প্রাপ্য। নেপোলিয়ন যথার্থই বলেছিলেন—"অহমিকাই বিপ্লব ঘটিয়েছিল, স্বাধীনতা ছিল অজুহাত মাত্র।"

অর্থনৈতিক ঃ যাজক ও অভিজাতদের কর দিতে হত না। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তরা করের চাপে ছিল অতিষ্ঠ। কৃষকদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। চার্চ, সামন্তপ্রভু ও রাজাকে কর দেওয়ার পর তাদের হাতে থাকত আয়ের শতকরা উনিশ ভাগ মাত্র। কর ছিল নানা ধরনের, কত বিচিত্র তাদের নাম—'টাইথ' বা ধর্ম কর, 'গৈবেলা' বা লবণ কর, 'টেইলি' বা জমির উপর ধার্য কর। এছাড়া 'করভি' নামে শ্রম কর দিত কৃষকরা অর্থাৎ কতকগুলি নির্দিষ্ট দিনে রাজা বা সামন্তপ্রভুর কাজে বেগার খাটতে হত। ফরাসী বিপ্লবের প্রাক্কালে মুদ্রাস্ফীতির ফলে জিনিসপত্র হয়ে যায় অগ্নিমূল্য।

দার্শনিক ঃ মণ্টেস্কু, ভল্‌টেয়ার, রুশো প্রমুখ দার্শনিকদের

সম্বন্ধে আগেই আলোচনা হয়েছে। তাঁরা প্রচলিত সমাজ-রাষ্ট্র-ধর্মব্যবস্থার দোষত্রুটি সমালোচনা করে বিশেষত মধ্যবিত্তদের মনে এগুলির সম্বন্ধে অশ্রদ্ধা জাগিয়েছিলেন— এগুলিকে যুক্তি দিয়ে বিচার করতে শিখিয়েছিলেন, সুতরাং বিপ্লবের জন্য পরোক্ষভাবে দার্শনিকরা তাদের মানসিক প্রস্তুতি করে গিয়েছিলেন বলা যায়।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ চরম আর্থিক দুর্গতিতে পড়ে টাকা-পয়সা মঞ্জুরের জন্য ষোড়শ লুই জাতীয় মহাসভা আহ্বান করলেন। জনগণের ধারণা হল রাজার স্বৈরশাসন ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা বিপ্লবের পথে এগিয়ে গেল।

ফরাসী বিপ্লবের গতি ঃ চরম আর্থিক দুর্গতি থেকে মুক্তি
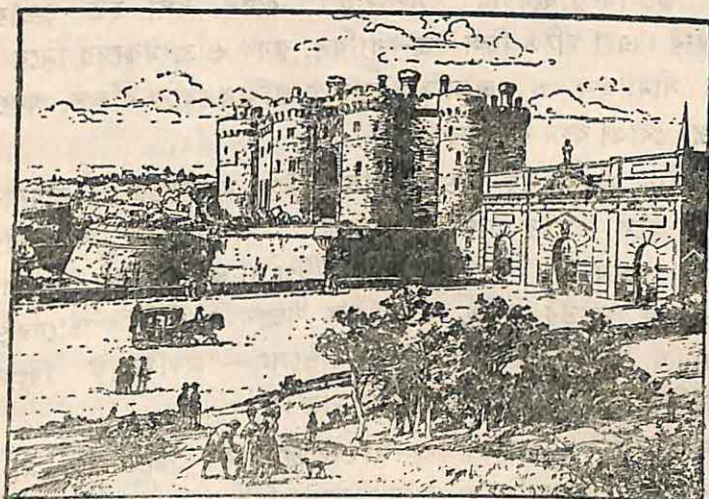
অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিল কারাগার

পাওয়ার জন্য ষোড়শ লুই জাতীয় মহাসভা আহ্বান করলেন। কিন্তু টাকা-পয়সা মঞ্জুরের পরিবর্তে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাদের অসন্তোষের কথা প্রকাশ করল। রাজা তাদের অধিবেশন-ঘর তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করায় তারা একটি টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে শপথ নিল, যতদিন তারা ফ্রান্সের জন্য লিখিত সংবিধান রচনা না করবে ততদিন তারা তাদের ঐক্য ভাঙবে না। ঘটনাটি **'টেনিস মাঠের শপথ'** বলে খ্যাত। ঐদিন বিপ্লবের শুরু। প্যারিসের জনতা

এগিয়ে এসে প্যারিসের শাসনভার নিজেদের হাতে তুলে নিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই তারা অত্যাচারের প্রতীক বাস্তিলের কারাগার ভেঙে বন্দীদের মুক্তি দিল। এরপর গ্রামাঞ্চলে শুরু হল সামন্ত-প্রভুদের বিরুদ্ধে কৃষক অভ্যুত্থান। উত্তেজিত দুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্ত্রী-জনতা রাজা ও রানীকে প্রায় বন্দী করে ভার্সাই থেকে নিয়ে এল প্যারিসে।

এদিকে ১৭৮৯ থেকে ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা গঠিত সংবিধান পরিষদ মানুষের অধিকারপত্র ঘোষণা করল। বলা হল, মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মেছে এবং সকলে সমান অধিকারের অধিকারী। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধান রচিত হল। ধর্ম কর উচ্ছেদ হল। রাজার ক্ষমতা বহু পরিমাণে কমান হল। চার্চের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে রাষ্ট্রের অধীনে আনা হল। আইন রচনায় সমস্ত ক্ষমতা পেল আইন সভা।

এযাবৎ বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিলেন মিরাবোঁ, লাফায়েৎ প্রমুখ উচ্চ মধ্যবিত্তরা। বিপ্লবের সুফল ভোগ করতে থাকে উচ্চ মধ্যবিত্তরাই। ফলে নিম্ন মধ্যবিত্তরা ক্ষুব্ধ হয়। দুটি সাধারণতান্ত্রিক দল গড়ে উঠতে থাকে—একটির নাম গিরণ্ডিস্ট ও অন্যটি জ্যাকোবিন। অস্ট্রিয়ার সম্রাট ফ্রান্স আক্রমণের হুমকি দিচ্ছিলেন। এর মোকাবিলা করা ও অন্যান্য কারণে আইন সভা রাজাকে বাধ্য করল অস্ট্রিয়া-প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে।

যুদ্ধে ফ্রান্স পরাজিত হতে থাকল। উন্মত্ত জনতা এর জন্যে দায়ী করল রাজাকে। তারা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল এবং আইন সভাকে বাধ্য করল রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করতে (১০ই আগস্ট, ১৭৯২ খ্রীঃ)। ফ্রান্স একটি প্রজাতান্ত্রিক দেশে পরিণত হল। দেশদ্রোহের অপরাধে গিলোটিন যন্ত্রে রাজা ষোড়শ লুই-এর শিরশ্ছেদ করা হল (২১শে জানুয়ারী, ১৭৯৩ খ্রীঃ)।

রাজার হত্যার পর ছটি শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হল। বিপ্লব-বিরোধী আন্দোলন মাথা-চাড়া দিতে থাকল ফ্রান্সে। দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা থাকল না, প্রায় গৃহযুদ্ধ বেধে উঠল। ফ্রান্সের ঘরে-বাইরের এই বিপদে জ্যাকোবিনরা জনগণকে ভয় দেখিয়ে, হাজার হাজার মানুষকে গিলোটিনে হত্যা করে শাসন পরিচালনা করল। একে বলা হয় 'সন্ত্রাসের রাজত্ব।'

সন্ত্রাসের রাজত্বের কৃতিত্ব হিসেবে বলা যায়, জ্যাকোবিনরা বিদেশী-দের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা থেকে বিপ্লবকে বাঁচিয়েছিল। কিন্তু শেষ দিকে এই রাজত্বের অন্যতম নেতা রোবস্‌পিয়র একনায়ক হয়ে বসেন। শেষ পর্যন্ত মধ্যবিত্তরা রোবস্‌-পিয়রকে বন্দী করে হত্যা করে এবং এই রাজত্বের অবসান ঘটায়।

এরপর মধ্যবিত্তরা ডাইরেক্টরী নামে শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। ডাইরেক্টরী দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা বা পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত নেপোলিয়ন সমস্ত ক্ষমতা দখল করেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরেই ফ্রান্স তথা ইউরোপের ইতিহাসের মঞ্চে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের আবির্ভাব। নিজ প্রতিভা ও বাহুবলে সামান্য অবস্থা থেকে তিনি শুধু ফ্রান্স নয় ইউরোপের ভাগ্য-বিধাতা হয়েছিলেন।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

কর্সিকার অ্যাজাচ্চো নামে জায়গায় তাঁর জন্ম (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পিতা কার্লো ছিলেন পেশায় উকিল, মাতার নাম লেটিজিয়া। ছাত্রজীবনেই নেপোলিয়নের চরিত্রে যুক্তিবাদের সঙ্গে ভাবপ্রবণতার এক আশ্চর্য সমন্বয় লক্ষ্য করা যায়। তিনি ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, ফরাসী দার্শনিকদের রচনা পাঠ করতে ভালবাসতেন।

বিপ্লবের সৈনিক নেপোলিয়ন ঃ নেপোলিয়ন ফ্রান্সের গোলন্দাজ বাহিনীতে সামান্য একজন গোলন্দাজ হিসেবে জীবন শুরু করেন। বিপ্লব চলাকালে জ্যাকোবিন দলের সভ্য হন। জ্যাকোবিন দলের শাসনকালে ইংল্যাণ্ডের নৌবহর তুলো বন্দর আক্রমণ করলে নেপোলিয়ন তা রণনৈপুণ্যে রক্ষা করেন। আবার তাঁরই দক্ষতায়

কনভেশন ও তার নেতারা রক্ষা পান প্যারিসের উন্মত্ত জনতার হাত থেকে (১৭৯৫ খ্রীঃ)। ডাইরেক্টরীর শাসনকালে সার্ডিনিয়াকে পরাজিত করেন, ইটালীতে অস্ট্রিয়ার প্রাধান্য নাশ করেন এবং অস্ট্রিয়া তাঁর সঙ্গে ক্যাম্পোফোর্মিওর সন্ধি (১৭৯৭ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। এইভাবে ফ্রান্স ও বিপ্লব-বিরোধী-জোটকে তিনি ভেঙে দেন ; এরপর ভারতবর্ষ প্রভৃতি প্রাচ্যদেশ থেকে ইংল্যাণ্ডের অধিকার ক্ষুণ্ণ করার উদ্দেশ্যে তিনি মিশর অভিযান করেন। সেখানে নীলনদের নৌযুদ্ধে তিনি ইংরেজদের হাতে পরাজিত হলেও পিরামিডের স্থলযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। ডাইরেক্টরীর অপদার্থতার সুযোগে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে তিনি ক্ষমতা দখল করেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)।

এরপর নেপোলিয়ন কনসালেট নামে এক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তিনি ছিলেন প্রথম কন্সাল। ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার জোট ভেঙে দিয়ে তিনি ফ্রান্সকে রক্ষা করলেন। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শাসন সংস্কার, রাস্তাঘাট নির্মাণ, অর্থনৈতিক সংস্কার, শিক্ষা সংস্কার, ধর্ম সংস্কার এবং সর্বোপরি আইন সংস্কার তাঁর অক্ষয় কীর্তি।

সম্রাট হিসেবে :

১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্রাট হন। এরপর তিনি বহু দেশ জয় করেন। ইটালী, জার্মানি, হল্যাণ্ড, সুইজারল্যাণ্ড, পর্তুগাল, স্পেন তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়াকে পরাজিত করেন। টিলসিটের সন্ধি (১৮০৭ খ্রীঃ) দ্বারা তিনি রাশিয়ার জার আলেকজাণ্ডারকে নিজ দলে টেনে আনেন। ইংল্যাণ্ড ছাড়া তাঁকে কর্তব্যে বাধা দেওয়ার মত আর কেউ রইল না।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে চালিয়ে গেল আপসহীন সংগ্রাম। ইংল্যাণ্ড ছিল দ্বীপ এবং নৌবলে শ্রেষ্ঠ। নেপোলিয়ন

বুঝেছিলেন তাকে নৌযুদ্ধে পরাজিত করা যাবে না। তাই তাঁর ভাষায় "দোকানদারের জাত" ইংরেজদের আসল শক্তি অর্থাৎ বাণিজ্য শক্তিকে তিনি ধ্বংস করতে চাইলেন। তিনি ঘোষণা করেন, তাঁর সাম্রাজ্য ও মিত্রশক্তির রাজ্যে ইংল্যাণ্ডের তৈরি জিনিস ঢুকতে পারবে না। এই নীতির নাম মহাদেশীয় ব্যবস্থা।

কিন্তু ইংল্যাণ্ড সস্তায় ভাল জিনিস সরবরাহ করতে পারত। ফলে ইউরোপের সব দেশই চোরাপথে ইংল্যাণ্ডের জিনিস আনতে শুরু করল। অথচ মহাদেশীয় ব্যবস্থা কার্যকর করতে গিয়ে নেপোলিয়ন বহু যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন, প্রচুর অর্থ ও লোকক্ষয় করেন। তাঁর বিরুদ্ধে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি সংঘবদ্ধ হয়। স্পেন ও পর্তুগাল নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে উপদ্বীপের যুদ্ধ শুরু করে। দীর্ঘ ছ'বছর তিনি এই যুদ্ধে অর্থ ও জীবননাশ করেও পরাজিত হন। তিনি নিজেই বলেছেন "স্পেনীয় ক্ষত" তাঁর সর্বনাশ করেছে। ইতিমধ্যে অস্ট্রিয়া প্রতিশোধ নেবার জন্য সামরিক প্রস্তুতি চালাতে থাকে। প্রাশিয়া নানা সংস্কারের মাধ্যমে নিজেকে শক্তিশালী করে তোলে। আবার, মহাদেশীয় ব্যবস্থা লঙ্ঘন করায় রাশিয়াকে শাস্তি দিতে নেপোলিয়ন রাশিয়া অভিযান করেন (১৮১২ খ্রীঃ)। সেখানে কোন যুদ্ধে পরাজিত না হয়েও তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হল শীতে, খাদ্যাভাবে ও রাশিয়ার গরিলাবাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে। তখন তাঁর শত্রুরা নিজেদের মধ্যে সন্ধি করে তাঁর বিরুদ্ধে আরম্ভ করল মুক্তিযুদ্ধ। মনে রাখতে হবে বিজিত রাজ্যগুলিতে নেপোলিয়ন বিপ্লবের সুফল (যেমন আইনের সমতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সকলের সমান সুযোগ-সুবিধে ভোগের অধিকার, সাম্যভিত্তিক সমাজ) ছড়িয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর জঙ্গীবাদী নীতি তাদের বিক্ষুব্ধ করেছিল। তাই সমস্ত ইউরোপের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের কাছে নেপোলিয়নকে মাথা নোয়াতে হল। তাঁর সর্বশেষ যুদ্ধ ওয়াটার্লুতে (১৮১৫ খ্রীঃ) পরাজিত হয়ে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত

হলেন। পাঁচ বৎসর পর সেখানেই তিনি পরলোক গমন করেন (১৮২১ খ্রীঃ)।

ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল ঃ ইউরোপ তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এই বিপ্লবের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী মানুষের পুরনো মূল্যবোধ পাল্টে দেয়। আইনের চোখে সমতা, বংশকৌলিন্যের পরিবর্তে প্রকৃত যোগ্যতার সমাদর, ধর্মপালনের স্বাধীনতা, সাম্যভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছিল। আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসে এই বিপ্লবের সবচেয়ে বড় অবদান জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের আদর্শ। সহজ কথায় জাতীয়তাবাদের অর্থ হল ঃ কোন জাতি বিদেশীদের অধীনে থাকবে না, তারা স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়ে তুলবে ; গণতন্ত্রবাদের অর্থ হল ঃ জনগণের হিতে জনগণ দ্বারা পরিচালিত হবে শাসন ব্যবস্থা। পূর্ণ উনিশ শতক ধরে ইউরোপের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনের পেছনে এই রাজনৈতিক আদর্শ প্রেরণা যুগিয়েছিল।

নবম অধ্যায় | ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ইউরোপ
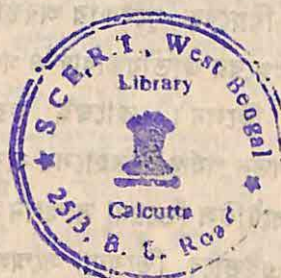
॥ ভিয়েনা সম্মেলন ॥ নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে ইউরোপের বড় শক্তিগুলির এক অধিবেশন বসে। এই অধিবেশন ভিয়েনা সম্মেলন নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়ার প্রধান মন্ত্রী মেটারনিক এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। ক্ষতিপূরণ ও পুরস্কার, ন্যায্য অধিকার এবং শক্তিসাম্য—এই তিনটি নীতির ভিত্তিতে সম্মেলনের প্রস্তাবগুলি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুসারে বিজয়ী রাষ্ট্রগুলি ইউরোপের কয়েকটি অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। ফ্রান্স, স্পেন, নেপলস্, হল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে আগেকার রাজবংশগুলিকে শাসন ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনা হয়। রাষ্ট্রগুলির বিলিবণ্টন এমনভাবে করা হয় যাতে ইউরোপের বড় শক্তিগুলি এককভাবে শক্তিশালী না হয় এবং ভবিষ্যতে ফ্রান্স ইউরোপের শান্তিভঙ্গ করতে না পারে। আসলে ইউরোপের পুনর্গঠন ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাগণ ফরাসী বিপ্লবের পূর্বেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। ফরাসী বিপ্লবের জাতীয়তাবাদ ও গণতান্ত্রিক চিন্তাধারার তাঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের শুরু থেকে নেপোলিয়নের পতন পর্যন্ত ইতিহাসের ধারায় যে প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার প্রসার ঘটেছিল ভিয়েনা সম্মেলন তাঁকে সমূলে ধ্বংস করতে উদ্যোগী হয়। এইভাবে ভিয়েনা সম্মেলনে ফরাসী বিপ্লব-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জয় সূচিত হয়।

॥ মেটারনিক ব্যবস্থা ॥ ভিয়েনা সম্মেলনের পর থেকে ইউরোপে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির জীবন্ত প্রতীক ছিলেন অস্ট্রিয়ার

মেটারনিক। অস্ট্রিয়া তথা সারা ইউরোপে প্রগতিশীল ও উদারনৈতিক প্রভাব ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মেটারনিক যে নীতি গ্রহণ করেন তা 'মেটারনিক ব্যবস্থা' নামে পরিচিত। অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তাবাদী প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য মেটারনিক সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন। স্বদেশপ্রেমী জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়। বিশ্ববিত্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের কড়া নজরে রাখা হয়। পাঠ্যসূচী থেকে ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিষয়কে বাদ দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। প্রগতিশীল আন্দোলনের বিষয়ে কড়া নজর রাখার জন্য রাজ্যের সর্বত্র গুপ্তচর নিয়োগ করা হয়। অন্যদেশ থেকে বিপ্লবী ভাবধারা যাতে অস্ট্রিয়ায় না আসতে পারে তার জন্য অস্ট্রিয়ায় পাঠানো যে-কোন কাগজপত্র পরীক্ষা করে দেখার ব্যবস্থা হয়। জার্মানির গণতান্ত্রিক আন্দোলন প্রতিরোধ করার জন্য ডিক্রি জারী করা হয়। এই কুখ্যাত নির্দেশনামার বলে জার্মানির শিল্প প্রতিষ্ঠান, ছাত্রসমাজ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়। ইটালীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত রেখে ইটালীর গণতান্ত্রিক আন্দোলন রোধ করা হয়।

মেটারনিক

॥ **ইউরোপীয় শক্তিসংঘ** ॥ কেবলমাত্র অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রতিবিপ্লবী দুর্গ গঠন করেই মেটারনিক ক্ষান্ত ছিলেন না। সমগ্র ইউরোপকে বিপ্লবী দর্শন-মুক্ত করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। কাজেই ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারা থেকে ইউরোপকে রক্ষা করার জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ
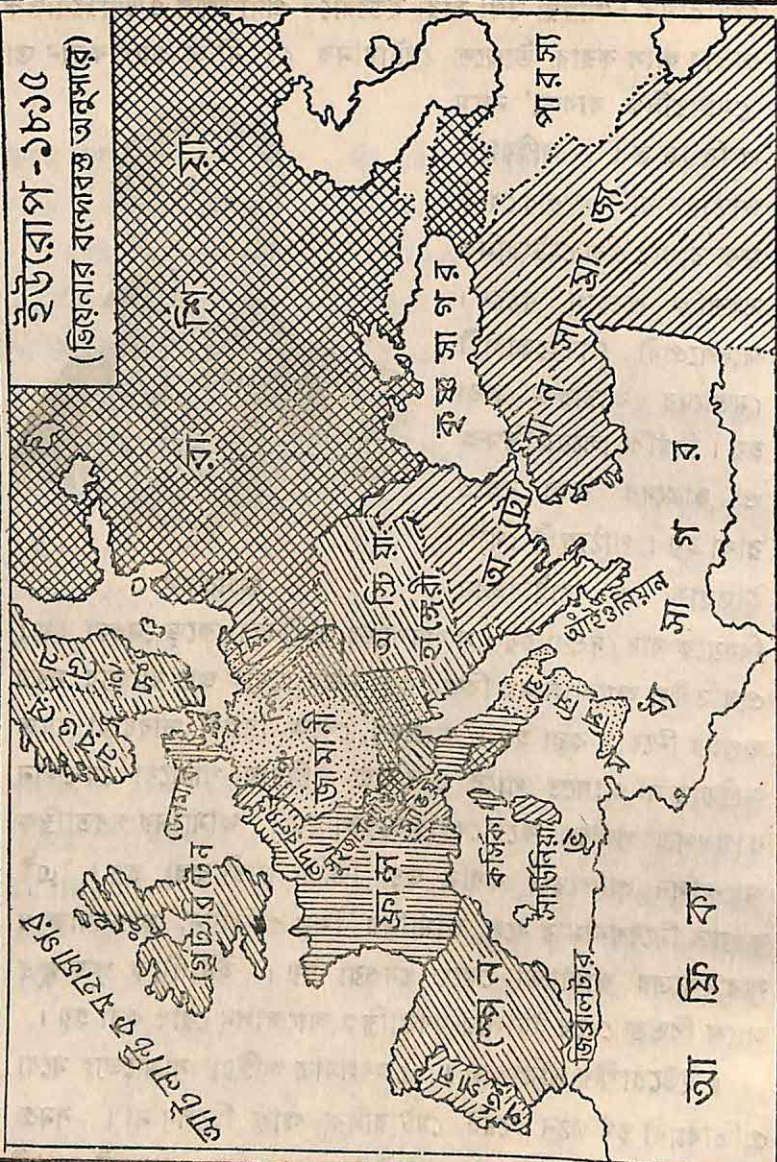
সংস্থার প্রয়োজন হয়। এই উদ্দেশ্যে ইউরোপের চারটি প্রধান রাষ্ট্র ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া এবং রাশিয়া একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করে। এই "চতুঃশক্তি চুক্তি"র ফলে যে রাষ্ট্রজোট গড়ে ওঠে তা "ইউরোপীয় শক্তিসংঘ" নামে পরিচিত। স্থির হয় যে ইউরোপে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখা দিলে এই রাষ্ট্রগুলি বৈঠকে মিলিত হয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮.৮ হতে ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আয়লা স্যাপেল, ট্রপো, লাইবেক এবং ভেরোনা —এই চারটি স্থানে শক্তিসংঘের বৈঠক হয়।

॥ **ইউরোপীয় শক্তিসংঘের যুগ** ॥ আয়লা স্যাপেলের সম্মেলনে ফ্রান্সকে শক্তিসংঘের সদস্য করা হয়। স্পেন, পর্তুগাল এবং নেপল্‌সে গণ-বিক্ষোভ শুরু হলে ট্রপোর বৈঠক বসে। এই বৈঠকে জনসাধারণের বিদ্রোহ দমনের জন্য শক্তিসংঘের সৈন্য পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়। লাইবেক অধিবেশনে নেপল্‌স ও ইটালীর অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমন করার জন্য অস্ট্রিয়াকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। চতুর্থ বৈঠক বসে ভেরোনায়। তুরস্কের বিরুদ্ধে গ্রীকদের বিদ্রোহ এবং স্পেনে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন প্রভৃতি বিষয়গুলি এই অধিবেশনে আলোচনা করা হয়। গ্রীক-বিদ্রোহ দমন করার প্রস্তাব গৃহীত হয় না। কিন্তু স্পেনে বিদ্রোহ দমনের সিদ্ধান্ত ইংল্যাণ্ডের আপত্তি সত্ত্বেও গৃহীত হয়। ফলে শক্তিসংঘের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের সম্পর্ক ছেদ হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের উপনিবেশগুলি বিদ্রোহী হলে স্পেন শক্তিসংঘের সাহায্যে বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা করে। কিন্তু আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট মনরো ঘোষণা করেন যে আমেরিকার ব্যাপারে ইউরোপের নাক গলানো চলবে না। এই ঘোষণা 'মনরো নীতি' নামে পরিচিত। এতদিনে শক্তিসংঘের চূড়ান্ত পরাজয় হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের সময় 'মেটারনিক ব্যবস্থা' ভেঙে পড়ে। মেটারনিক ভিয়েনা থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

॥ **ইউরোপে জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রসার** ॥ নেপোলিয়নের

পরাজয়ের পর ইউরোপের বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইউরোপকে নতুন ভাবে গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়। কিন্তু প্রতিবিপ্লবী ও প্রগতি-বিরোধী ইউরোপের রাষ্ট্রবর্গ জনসাধারণের এই আশা-আকাঙ্ক্ষার কোন মূল্য দেয় না। বরং ইউরোপে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার দোহাই দিয়ে ইউরোপের সর্বত্র গণ-আন্দোলন দমন করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনসাধারণ আন্দোলন চালাতে থাকে। ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, স্পেন, সুইডেন প্রভৃতি স্বাধীন দেশের জনগণ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত ইটালী ও জার্মানিতে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের জন্য জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। পোল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, নরওয়ে প্রভৃতি পরাধীন দেশগুলি একই সঙ্গে জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল হয়। এই সময়কার জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে ইটালী ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ ইটালীর ঐক্য আন্দোলন ॥ ফরাসী বিপ্লবের আগে ইটালী কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টিমাত্র ছিল। নেপোলিয়ন ইটালীকে ফরাসী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। নেপোলিয়নের শাসনে ইটালী সর্বপ্রথম ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়। কিন্তু ভিয়েনা সম্মেলনে ইটালীকে পুনরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত করা হয়। কেবলমাত্র পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় ইটালীর স্বাভয় রাজবংশ ছাড়া ইটালীর বিভিন্ন অংশ অস্ট্রিয়া ও অন্যান্য বিদেশী রাজাদের অধীনে আনা হয়। ইটালী একটি "ভৌগোলিক সংজ্ঞায়" মাত্র পরিণত হয়।

॥ কার্বোনারী সমিতির বিদ্রোহ ॥ কিন্তু জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ইটালীবাসী এই ব্যবস্থা মেনে নিতে সম্মত হয় না। বিদেশী শাসকের অত্যাচার-মুক্ত হওয়ার জন্য দক্ষিণ ইটালীতে কার্বোনারী নামে গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। এই সমিতির উদ্যোগে

ইতালীর ঐক্য
সুইজারল্যাণ্ড
স্যাভয়
লোম্বার্ডি
মিলান
ভেনিশিয়া
পাইডমন্ট
পার্মা
মডেনা
পোপেররাজ্য
নিস
মার্চেস
টাস্কেনি
এল্‌বা
কর্সিকা
রোম
আড্রিয়াটিক সাগর
অ্যাপুলিয়া
ক্যাম্পানিয়া
সার্ডিনিয়া
ন্যাপল্‌স
ভূমধ্য সাগর
ক্যালাব্রিয়া
সিসিলি
পাইড্‌মন্ট সার্ডিনিয়া রাজ্য
১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সংযুক্ত
১৮৬০ " "
১৮৬১ " "
১৮৬৬ " "
১৮৭০ " "

১৮২০ ও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ শুরু হয়। কিন্তু অস্ট্রিয়ার মেটারনিক বলপ্রয়োগে এই বিদ্রোহ দমন করেন।

॥ **ম্যাট্‌সিনি ও তরুণ ইটালী** ॥ কার্বোনারী সমিতির সশস্ত্র বিপ্লব ব্যর্থ হওয়ার পর ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন ম্যাট্‌সিনি। তাঁকে 'ইটালীর স্বাধীনতার জনক' বলা হয়। তিনি 'তরুণ ইটালী' নামে একটি সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এর মাধ্যমে ইটালীর তরুণ সম্প্রদায়কে তিনি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লবের প্রভাবে ইটালীর অনেক অঞ্চলে গণ-বিক্ষোভ শুরু হয়। লম্বার্ডি ও ভেনিসিয়ার বিদ্রোহীগণ অস্ট্রিয়ানদের বিতাড়িত করে। ম্যাট্‌সিনির নেতৃত্বে রোমে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পিড্‌মণ্ট-সার্ডিনিয়ার রাজা চার্লস আলবার্ট অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি অস্ট্রিয়ার কাছে পরাজিত হওয়ায় ইটালীর সর্বত্র পুনরায় স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়। ফরাসী সেনাবাহিনী রোমের প্রজাতন্ত্রের পতন ঘটায়।

ম্যাট্‌সিনি

॥ **কাউণ্ট কাভুর** ॥ জাতীয় আন্দোলনের ব্যর্থতায় যখন সারা ইটালী জুড়ে হতাশা, তখন ইটালীবাসীর সামনে আশার আলো জ্বালাতে এগিয়ে আসেন কাউণ্ট কাভুর। বিচক্ষণ ও বাস্তববাদী রাজনীতিবিদ্ কাউণ্ট কাভুর ছিলেন সার্ডিনিয়ার প্রধানমন্ত্রী। তিনি বিশ্বাস করতেন যে সার্ডিনিয়ার নেতৃত্বে এবং একমাত্র বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে অস্ট্রিয়াকে হঠিয়ে ইটালীর ঐক্যসাধন সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে

তিনি পিডমণ্ট-সার্ডিনিয়ায় কৃষি, বাণিজ্য, নৌবিভাগ ও সামরিক বিভাগের ব্যাপক সংস্কারসাধন করেন। এরপর তিনি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে যোগদান করেন। যুদ্ধ-শেষে প্যারিস সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি ইটালীর সমস্যাকে বিদেশী রাষ্ট্রের সামনে তুলে ধরেন। অস্ট্রিয়াকে হঠানোর জন্য ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়ন এবং কাভুরের মধ্যে 'প্লমবিয়ার্সের চুক্তি' হয়। এর পর নানা কৌশলে কাভুর অস্ট্রিয়াকে ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে বাধ্য করেন। যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। কিন্তু তৃতীয় নেপোলিয়ন অস্ট্রিয়ার সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সন্ধি করায় কাভুরের পরিকল্পনা পুরোপুরি সফল হয় না। জুরিখের সন্ধি দ্বারা লম্বার্ডি সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। ইতিমধ্যে পার্মা, মোডেনা, টাস্কানি প্রভৃতি অঞ্চল সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য আন্দোলন করে। অস্ট্রিয়া ও তৃতীয় নেপোলিয়ন এতে বাধা দেন। এই অবস্থায় কাভুর পুনরায় মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ইটালীর এই রাজ্যগুলি সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।

কাউণ্ট কাভুর

॥ গ্যারিবল্ডি ॥ ইটালীর আন্দোলন কিছুটা সফল হলেও ভেনিসিয়া, পোপের রাজ্য, নেপলস্ ও সিসিলি তখনও পর্যন্ত মুক্তিলাভ করে না। ইটালীর মুক্তি-আন্দোলনের এই পর্বে গ্যারিবল্ডি নামে একজন দেশপ্রেমিক সৈনিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। ইতিমধ্যে নেপল্‌সের রাজার বিরুদ্ধে সিসিলি দ্বীপে বিদ্রোহ দেখা দেয়। বিদ্রোহীগণ গ্যারিবল্ডিকে নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। গ্যারিবল্ডি তাঁর 'লাল কোর্তা' বাহিনীর সাহায্যে সিসিলি ও

নেপলস্ দখল করেন। এখানকার শাসনভার তিনি সার্ডিনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ভিক্টর ইমানুয়েলের হাতে তুলে দেন। এইভাবে ভেনিসিয়া ও রোম ছাড়া প্রায় সমগ্র ইটালী সার্ডিনিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। এর কয়েক বৎসর পর অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধে অস্ট্রিয়া পরাজিত হয় এবং ইটালীকে ভেনিসিয়া রাজ্য ছেড়ে দেয়। অপরপক্ষে ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধের সময় রোম থেকে ফরাসী সৈন্য সরিয়ে নিয়ে ইটালীর সেনাবাহিনী রোম দখল করে। এইভাবে দীর্ঘ লড়াই-এর পর শতধা-বিভক্ত ইটালী একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

গ্যারিবল্ডি

॥ জার্মানির ঐক্য আন্দোলন ॥ নেপোলিয়নের পতনের পর জার্মানিও ইটালীর মত একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞায় পরিণত হয়। উনচল্লিশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের একটি শক্তিহীন রাষ্ট্রসংঘ রূপে জার্মানির অস্তিত্ব টিকে থাকে। অস্ট্রিয়ার মেটারনিকের নির্দেশেই জার্মানির শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। জার্মানির বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিবিপ্লবী ও রক্ষণশীল শাসকবর্গ থাকায় জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের বিশেষ প্রসার ঘটে না। কিন্তু কঠোর দমননীতি সত্ত্বেও সেই সময়ের জার্মান দার্শনিক, কবি, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিকগণের রচনা জার্মানিতে জাতীয়তাবাদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে। এ ছাড়া জার্মানির সব রাজ্যে একই ধরনের শুল্ক চালু করার জন্য প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'জোলভারিন' নামে একটি শুল্কসংঘ গড়ে ওঠে। এই সংঘের মাধ্যমে

জার্মানীর ঐক্য
মূলরাজ্য ১৮৬৪ খ্রীঃ
পরবর্তী সংযুক্ত
১৮৬৬ খ্রীঃ
১৮৭১ খ্রীঃ
ফ্রান্স হইতে ১৮৭১ খ্রীঃ
বাল্টিক সাগর
উত্তর সাগর
রাশিয়া
অস্ট্রিয়া
ফ্রান্স
বেলজিয়াম
হল্যাণ্ড
স্লেজভিগ হলস্টিন
হ্যানোভার
মেকলেনবার্গ
স্যাক্সনী
ব্যাভেরিয়া
আলসেস লোরেন
হেস
ভিশ্চুলা নঃ
ওডার নঃ
এলব নঃ
রাইন নঃ
দানিয়ুব নঃ
নিয়েমেন নঃ
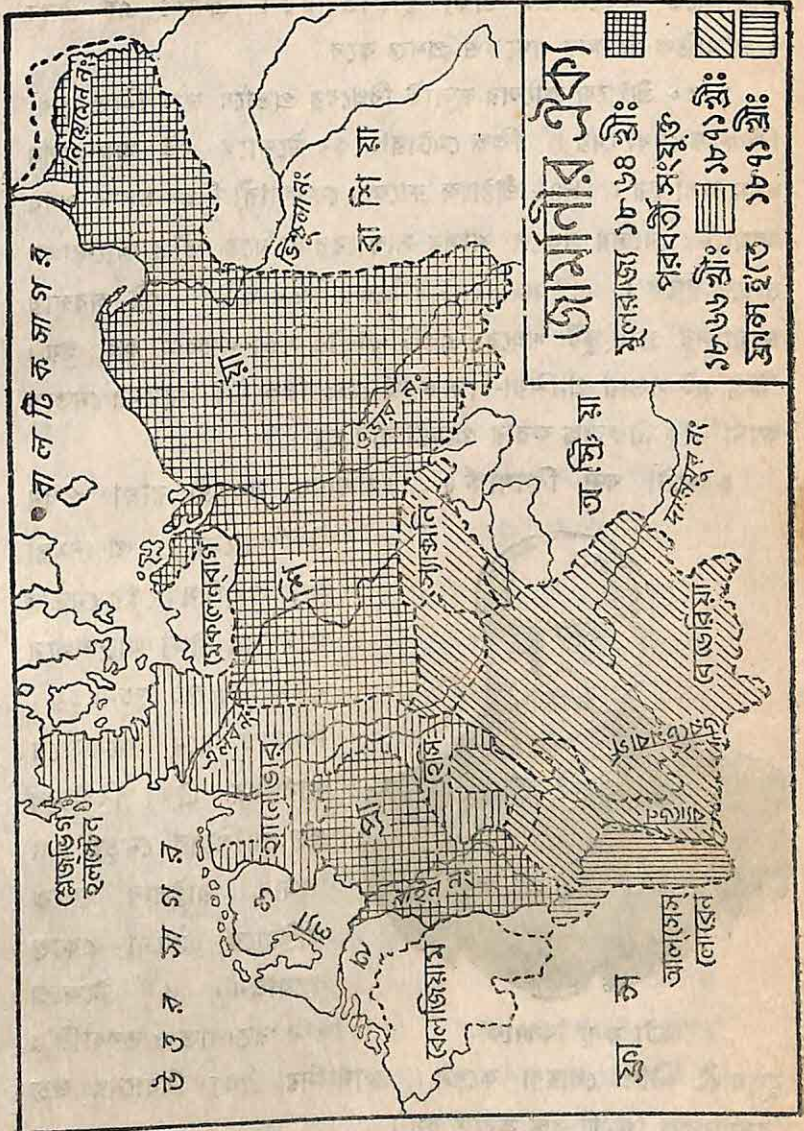
জার্মানিতে অর্থনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয়। ক্রমশঃ এই ঐক্য রাজনৈতিক ঐক্যের পথকেও প্রশস্ত করে।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের জুলাই বিপ্লবের প্রভাবে জার্মানিতে গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। কিন্তু মেটারনিকের উদ্যোগে এই আন্দোলন দমন করা হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের ফেব্রুয়ারী বিপ্লব চলার সময় জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চলে শাসন সংস্কারের দাবিতে তীব্র আন্দোলন চলতে থাকে। এই সময় মেটারনিকের পতন ঘটে। এই অবস্থায় জার্মানির ফ্রাঙ্ক্‌ফুর্ট শহরে একটি জাতীয় সভা আহ্বান করা হয়। কিন্তু এই সভায় প্রাশিয়া-রাজ চতুর্থ ফ্রেডারিক উইলিয়ামের নেতৃত্বে জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

॥ অটো ফন্ বিসমার্ক ॥ প্রাশিয়ার পরবর্তী রাজা প্রথম উইলিয়ামের প্রধানমন্ত্রী অটো ফন্ বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। বিসমার্ক মনে করেন যে জার্মানির ঐক্য বিধানের জন্য প্রাশিয়ার নেতৃত্ব এবং জার্মান রাষ্ট্রসংঘ থেকে অস্ট্রিয়াকে হঠানো একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি 'রক্তপাত ও তরবারি'র যুদ্ধবাদী নীতি ঘোষণা করেন। জার্মানির ঐক্য বিধানের জন্য বিসমার্ককে তিনটি যুদ্ধ করতে হয়।

অটো ফন্ বিসমার্ক

॥ ডেনমার্কের সঙ্গে যুদ্ধ (১৮৬৪ খ্রীঃ) ॥ শ্লেসউইগ ও হলস্টাইন নামে জার্মান সীমান্তে দুটি ছোট রাজ্য ছিল। ডেনমার্কের রাজা এই রাজ্য দুটি তাঁর রাজ্যভুক্ত করলে অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া ডেনমার্কের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ডেনমার্ক পরাজিত হওয়ায় এই রাজ্য দুটি ছেড়ে দেয়। 'গ্যাস্টাইনের সন্ধি' দ্বারা প্রাশিয়া শ্লেসউইগ এবং অস্ট্রিয়া হলস্টাইন লাভ করে। কিন্তু অস্ট্রিয়া এই দুই রাজ্যকে জার্মান রাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত করতে চাইলে প্রাশিয়া এই প্রস্তাবে সম্মত হয় না। ফলে প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ **অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ (১৮৬৬ খ্রীঃ)** ॥ বিসমার্ক কূটনীতির সাহায্যে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইটালীকে নিরপেক্ষ রেখে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হন। 'স্যাডোয়ার যুদ্ধে' অস্ট্রিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। 'প্রাগের সন্ধি' দ্বারা জার্মান রাষ্ট্রসংঘ ভেঙে দেওয়া হয় এবং প্রাশিয়ার নেতৃত্বে 'উত্তর জার্মান রাজ্যসংঘ' গঠিত হয়। অস্ট্রিয়াকে জার্মান রাষ্ট্রসংঘ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। অপরপক্ষে শ্লেসউইগ, হলস্টাইন, হ্যানোভার প্রভৃতি রাজ্য প্রাশিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়।

॥ **ফ্রান্স ও প্রাশিয়ার যুদ্ধ (১৮৭০ খ্রীঃ)** ॥ 'উত্তর জার্মান রাজ্যসংঘ' গঠিত হলেও দক্ষিণ জার্মানির রাজ্যগুলি তখনও বিচ্ছিন্ন ছিল। এইবার জার্মানির ঐক্য সম্পূর্ণ করার প্রশ্নে প্রাশিয়ার সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। স্পেনের সিংহাসনে লিওপোল্ডকে মনোনীত করার বিষয়কে কেন্দ্র করে এই যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ফ্রান্স আপত্তি করায় লিওপোল্ড এই মনোনয়ন গ্রহণ করেন না। কিন্তু দ্বিতীয়বার তাঁকে মনোনীত করা হয়। এই সময় প্রাশিয়ারাজ প্রথম উইলিয়াম এম্‌স্ শহরে ছিলেন। সেখানে গিয়ে একজন ফরাসী দূত দাবি করেন যে জার্মানিকে স্পেনের সিংহাসনের উপর কোন দাবি না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। উইলিয়াম এ বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন, এবং বিষয়টি টেলিগ্রাম করে বিসমার্ককে জানিয়ে দেন। বিসমার্ক এই সংবাদটি এমনভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন যে সংবাদপত্র পাঠ করে জার্মানি ও ফ্রান্স উভয় পক্ষ অসন্তুষ্ট হয় ও অপমানিত বোধ করে। অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফ্রান্স প্রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেডানের যুদ্ধে ফ্রান্স শোচনীয়

ভাবে পরাজিত হয়। ফ্রান্সের পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ জার্মানির চারটি রাজ্য উত্তর জার্মান রাষ্ট্রসংঘে যোগদান করে। এইভাবে বিসমার্কের কূটনীতির দ্বারা জার্মানির জাতীয়তাবাদী ঐক্য আন্দোলন সাফল্যলাভ করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানিতে 'যুক্ত জার্মান সাম্রাজ্য' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই নবগঠিত সাম্রাজ্যের সম্রাট ও চ্যান্সেলর হন যথাক্রমে প্রাশিয়া-রাজ প্রথম উইলিয়াম এবং এর পরে বিসমার্ক।

॥ **আমেরিকার গৃহযুদ্ধ : কারণ**॥ উনবিংশ শতাব্দীতে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আমেরিকার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। **ক্রীতদাস প্রথার** প্রশ্ন নিয়ে বিরোধ এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ষোড়শ শতাব্দীতে আমেরিকায় ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন হয়। কৃষিকার্যের জন্য আফ্রিকা থেকে নিগ্রো ক্রীতদাস আনা হত। এদের কোন স্বাধীনতা ছিল না। মালিকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মত এদেরও কেনা-বেচা চলত। ক্রমে এই প্রথার বিরুদ্ধে উত্তর আমেরিকায় জনমত গড়ে ওঠায় উত্তরের রাজ্যগুলি থেকে দাস প্রথা বিলুপ্ত করা হয়। কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় তুলোর চাষ বৃদ্ধি পাওয়ায় তুলোর ক্ষেতে কাজ করার জন্য ক্রীতদাসের চাহিদা বাড়ে। কাজেই দক্ষিণের রাজ্যগুলি এই প্রথা উচ্ছেদের বিরোধিতা করে। 'মিসৌরী চুক্তি' দ্বারা উভয় পক্ষে আপস হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও উত্তর ও দক্ষিণের অঞ্চলগুলির মধ্যে বিরোধ ছিল। উত্তর আমেরিকা ছিল শিল্পপ্রধান এবং দক্ষিণ আমেরিকা ছিল কৃষিপ্রধান। উত্তর অঞ্চলের দাবি ছিল সস্তা মজুর ও উচ্চহারের শুল্ক। অপর পক্ষে দক্ষিণ সস্তা জিনিস ও অবাধ বাণিজ্যের পক্ষপাতী ছিল। কাজেই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দুই অঞ্চলের মধ্যে রেষারেষি চরম সীমায় ওঠে।

রাজনৈতিক কারণেও দুই অঞ্চলের বিরোধ ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। উত্তরের রাজ্যগুলি সংখ্যায় বেশী হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের সকল ব্যাপারে তাদের প্রাধান্য ছিল। এর ফলে দক্ষিণের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র থেকে

বিচ্ছিন্ন হতে চায়। কারণ তারা মনে করে যে উত্তর আমেরিকার প্রাধান্য থেকে মুক্ত না হলে তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে না। ইতিমধ্যে দাস প্রথা-বিরোধী আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হওয়ায় উভয় পক্ষের যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। দক্ষিণের রাজ্যগুলি যুক্তরাষ্ট্র হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্রসংঘ গঠন করে। অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সংহতি রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হলে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।

॥ গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের ভূমিকা ॥ আমেরিকার ইতিহাসে আব্রাহাম লিঙ্কন একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম। সামান্য অবস্থা থেকে তিনি আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদে উন্নীত হন। রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই তাঁকে আমেরিকার গৃহযুদ্ধের মত বিরাট সমস্যার মেকাবিলা করতে হয়। তিনি ক্রীতদাস প্রথা বিলোপের পক্ষপাতী ছিলেন ঠিকই। কিন্তু গৃহযুদ্ধে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকার অখণ্ডতা বজায় রাখা। কাজেই দক্ষিণী রাজ্যগুলিকে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে গণ্য করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন মত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যুদ্ধের প্রথম দিকে দক্ষিণের রাজ্যগুলি সাফল্যলাভ করে। এই অবস্থায় লিঙ্কন বিদ্রোহী রাজ্যগুলিতে দাসপ্রথার অবসান ঘোষণা করেন। যুদ্ধের প্রয়োজনেই তিনি এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই ঘোষণার ফলে যুক্তরাষ্ট্রে দাস-প্রথা বিলুপ্ত হয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রগুলি

আব্রাহাম লিঙ্কন

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি সহানুভূতি দেখায়। এরপর থেকে দক্ষিণের রাজ্যগুলির পরাজয় শুরু হয়। দীর্ঘ চার বৎসর পর ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে গৃহযুদ্ধের অবসান হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন এক সংকটময় অবস্থা থেকে আমেরিকাকে রক্ষা করতে সমর্থ হন। তাঁর নেতৃত্বে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষা পায় এবং কুখ্যাত দাস-প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। গৃহযুদ্ধ অবসানের ঠিক পাঁচদিন পরে জন্ উইল্‌কস বুথ নামে একজন অভিনেতার গুলিতে আব্রাহাম লিঙ্কন নিহত হন।

॥ **ইউরোপের যন্ত্রসভ্যতা** ॥ শিল্প বিপ্লব ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম শুরু হলেও ক্রমশঃ ইউরোপের অন্যান্য দেশে এর প্রসার ঘটে। লুই ফিলিপ ও তৃতীয় নেপোলিয়নের আমলে ফ্রান্সে অনেকগুলি শিল্প গড়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে জার্মানির রুঢ় ও সার উপত্যকায় ব্যাপক শিল্পের প্রসার হয়। ফ্রান্স ও জার্মানি ছাড়াও বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি ইউরোপের দেশগুলিতে শিল্পসভ্যতার বিকাশ ঘটে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার হয় এবং বড় বড় কলকারখানা গড়ে ওঠে। পরিবহণ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন হওয়ায় দ্রুতগতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাতায়াত করা যায়। টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে দ্রুত সংবাদ আদান-প্রদান করা যায়। এইভাবে শিল্পায়ন দ্রুত প্রসার লাভ করায় ইউরোপে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ ঘটে। যন্ত্রশিল্পই ইউরোপীয় সভ্যতার মানদণ্ডে পরিণত হয়।

॥ **ফলাফল** ॥ ইউরোপের এই দ্রুত শিল্পায়ন এই সময়ের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটায়। যন্ত্রশিল্পের ফলে কুটীর শিল্প ধ্বংস হয়। কারখানার কাজ পাওয়ার জন্য গ্রামবাসীরা শহরে চলে আসতে শুরু করে। শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলিতে জীবন-যাত্রার মান আগের তুলনায় উন্নত হয়। যন্ত্রজাত দ্রব্য মানুষের জীবনকে আরারামপ্রদ করে তোলে। শিল্পের উন্নতি হওয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের পরিমাণ বাড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ

হয়। একদিকে যেমন যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়, অপর দিকে তেমনি এক দেশের সঙ্গে আর এক দেশের রেষারেষি বাড়ে। কারণ শিল্পে উন্নত দেশগুলির পক্ষে সস্তায় কাঁচামাল সংগ্রহ ও শিল্পজাত জিনিসপত্র বিক্রয়ের জন্যে উপনিবেশ বিস্তারের একান্ত প্রয়োজন ছিল। কাজেই এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং উপনিবেশ বিস্তার নিয়ে নানা ধরনের যুদ্ধবিগ্রহের সৃষ্টি হয়। শিল্প প্রতিষ্ঠার ফলে দেশে এক নতুন পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রে ও সমাজে এই শ্রেণীই ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করতে থাকে।

॥ **শ্রমিক শ্রেণী** ॥ শিল্পবিস্তারের ফলে পুঁজিপতি শ্রেণীর পাশাপাশি আর এক নতুন শ্রেণীর জন্ম হয়। এরা হল শ্রমিক শ্রেণী। বড় বড় কলকারখানায়, বস্তি অঞ্চলে এরা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে দিন কাটায়। কারখানার মালিকরা বেশী মুনাফার দিকে নজর দেয়। কিন্তু শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য তারা কোন চেষ্টাই করে না। খুবই কম মজুরিতে এবং অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে ও চরম দুর্গতির মধ্যে তাদের জীবন কাটে। শ্রমিকদের চাকরির কোন নিরাপত্তা ছিল না। যুদ্ধবিগ্রহ বা কোন কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দা দেখা দিলে শ্রমিক ছাঁটাই ও মজুরি কমিয়ে দেওয়া হত। এই সমস্ত বেকার বা আধা-বেকার শ্রমিকদের রুজি-রোজগারের অন্য কোন ব্যবস্থা কারখানার মালিক বা দেশের সরকার করত না। শ্রমিকদের এই দুরবস্থার ফলে মালিক ও শ্রমিকের বিরোধ শুরু হয়। এই বিরোধ থেকেই শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা হয়। এক সাথে আন্দোলন করার জন্য নানা দেশে "শ্রমিক সংঘ" গড়ে ওঠে। এই শ্রমিক আন্দোলন থেকেই সমাজতন্ত্রবাদের জন্ম হয়। সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যেই মেহনতী শ্রমিক-শ্রেণী তাদের নতুন হাতিয়ার খুঁজে পায়।

॥ **কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস** ॥ আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের স্রষ্টা হলেন কার্ল মার্কস। তাঁর প্রবর্তিত সমাজতন্ত্রবাদের মূল উদ্দেশ্য সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা। কার্ল মার্কস জার্মানির এক ইহুদী পরিবারে জন্ম-

গ্রহণ করেন। জার্মান সরকার তাঁকে জার্মানি হতে বহিষ্কার করে। তিনি প্যারিসে চলে আসেন। এখানে তাঁর সাথে ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের পরিচয় হয়। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস ও এঙ্গেলসের বিখ্যাত পুস্তিকা **'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো'** বা 'সাম্যবাদী ইস্তাহার' প্রকাশিত হয়। এই ইস্তাহারেই সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত সাম্যবাদের ব্যাখ্যা করা হয়। কার্ল মার্কস রচিত 'ডাস ক্যাপিটাল' তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মার্কস ও এঙ্গেলসের মতে সমাজ কতকগুলি অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা শ্রেণী নিয়ে গঠিত। এই শ্রেণীগুলির পরস্পর বিরোধের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও সভ্যতা এগিয়ে চলেছে। বিভিন্ন যুগে এই শ্রেণী-বিরোধের বিভিন্ন আকার ধারণ করেছে। আধুনিক যুগে এই শ্রেণী-সংগ্রাম চলেছে পুঁজিপতি ধনিক শ্রেণী ও সর্বহারা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে। এই লড়াইয়ে শ্রমিক শ্রেণী জয়লাভ করবে। তারপর বিশ্বে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠবে। মার্কসের মতে 'শ্রমিকের কোন দেশ নাই'। সব দেশের শ্রমিকরাই শোষিত ও নির্যাতিত। কাজেই সারা পৃথিবীর শ্রমিক জোটবদ্ধ হয়ে শোষক ও অত্যাচারী পুঁজিবাদী মালিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর সামিল হবে। এই উদ্দেশ্যে মার্কস 'প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' গঠন করেন। মার্কস ও এঙ্গেলসের চিন্তাধারা বিশ্বের অর্থনীতি ও রাজনীতিতে এক নতুন যুগের সূচনা করে।

কার্ল মার্কস

॥ **অহিফেন যুদ্ধ ও নানকিং-এর সন্ধি** ॥ চীন এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে বড় দেশ। ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চীন বাইরের জগৎ হতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। চীনে কোন বিদেশী দূতের প্রবেশ নিষেধ ছিল। আবার চীনও বিদেশে কোন দূত পাঠাত না। কেবলমাত্র চীনের ক্যান্টন বন্দরে বিদেশী বণিকদের ব্যবসা-বাণিজ্যের কিছু সুযোগ-সুবিধা ছিল। উনবিংশ শতকের গোড়ার দিকে ক্যান্টনের ব্যবসা-বাণিজ্য মূলতঃ ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল। এরা ভারত থেকে আফিম আমদানি করে চীন দেশে চড়া দরে বিক্রি করত ও প্রচুর লাভ করত! চীনা কমিশনার লীন আফিং-এর ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করলে ইংরেজদের সঙ্গে চীনের যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধকে **'অহিফেন যুদ্ধ'** বলা হয়। যুদ্ধে চীন পরাজিত হয়। 'নানকিং-এর সন্ধি' (১৮৪২ খ্রীঃ) দ্বারা চীন ইংরেজদের হংকং বন্দরটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দেয়। এছাড়া আরও পাঁচটি বন্দর ইউরোপীয় বাণিজ্যের জন্য 'উন্মুক্ত বন্দর' বলে ঘোষণা করা হয়।

॥ **টিয়েনসিনের সন্ধি** ॥ প্রথম অহিফেন যুদ্ধে পরাজিত চীন সরকারের দুর্বলতার সুযোগে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, প্রাশিয়া, হল্যাণ্ড, রাশিয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশগুলি চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ব্যবসা-বাণিজ্য বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় বণিকরা চীনের কাছে নিত্যনতুন দাবি পেশ করে। শেষ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একযোগে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এই যুদ্ধ 'দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ' বা 'দ্বিতীয় অহিফেন যুদ্ধ' নামে পরিচিত। চীন সরকার এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং 'টিয়েনসিনের সন্ধি' করতে বাধ্য হয়।

সন্ধির শর্ত অনুসারে চীন ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হয়, এছাড়াও আরও এগারোটি বন্দর বিদেশীদের ব্যবসার জন্য ছেড়ে দিতে হয়। চীনের রাজধানী পিকিং-এ বিদেশী দূতাবাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হয়। ইউরোপীয় বণিকদের ধর্ম ও ধন-প্রাণ রক্ষার দায়িত্ব চীন সরকারকে নিতে হয়। আফিং আমদানি করার অধিকারও স্বীকার করে নিতে হয়। ইউরোপীয় খ্রীষ্টান মিশনারীরা চীনে অবাধ ধর্ম প্রচারের অনুমতি পায়। বিদেশীদের চীন সাম্রাজ্যে অবাধে ভ্রমণ করার অধিকার দেওয়া হয়। এছাড়া বিদেশীদের 'অতি-রাষ্ট্রিক' অধিকারও দেওয়া হয়। এই অধিকারের অর্থ হল চীনের বিদেশী বাসিন্দারা চীনে বাস করার সময়ে কোন অপরাধ করলে নিজের নিজের দেশে তাদের বিচার হবে। অর্থাৎ দেশের আইন অনুযায়ী বিদেশীদের বিচার ক্ষমতাও চীনের থাকবে না।

॥ **বিদেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা** ॥ টিয়েনসিনের সন্ধির পরবর্তী তিন বৎসরের মধ্যে ইউরোপের প্রায় সকল দেশ চীনে ব্যবসা-বাণিজ্য শুরু করে। ইতিমধ্যে আরও চারটি বন্দর বিদেশীদের হাতে আসে। এর পর চীন সাম্রাজ্যের অংশবিশেষ অধিকারের জন্য বিদেশী রাষ্ট্র-গুলির তৎপরতা বেড়ে ওঠে। ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে জাপানও চীনে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াতে উদ্যোগী হয়। জাপান চীনের কাছ থেকে লু-চু দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে। জাপান কোরিয়া দখল করতে গেলে চীন-জাপান যুদ্ধে বাধে। এই যুদ্ধে চীন শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। জাপানকে ফরমোজা এবং লিয়াও-টুং উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে হয়। রাশিয়া, ফ্রান্স ও জার্মানির চাপে শেষ পর্যন্ত জাপান লিয়াও-টুং উপদ্বীপ চীনকে ফিরিয়ে দেয়। চীনকে এই সুযোগ দেওয়ার বিনিময়ে প্রতিটি ইউরোপীয় রাষ্ট্র চীনে কতকগুলি বিশেষ সুযোগ-সুবিধা আদায় করে। চীনের এক একটি অঞ্চল ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়। রাশিয়া

মাঞ্চুরিয়া লাভ করে। জার্মানি পায় কিয়াও-চাও বন্দর, ওয়ে-হাই-ওয়ে যায় ইংল্যাণ্ডের দখলে। কোয়ানটুং ফ্রান্সের দখলে আসে।

॥ **উন্মুক্তদ্বার নীতি** ॥ চীনদেশকে কেন্দ্র করে বিদেশী শক্তিগুলির এই প্রতিযোগিতার ফলে চীনদেশ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়। এই অবস্থায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব জন্ হে চীনের অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য একটি নীতি ঘোষণা করেন। এই নীতি '**উন্মুক্তদ্বার নীতি**' নামে পরিচিত। এই নীতি অনুসারে বলা হয় যে, চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপারে সব রাষ্ট্রের সমান অধিকার থাকবে। ইউরোপের দেশগুলি এই নীতি স্বীকার করে নেওয়ায় চীনের অখণ্ডতা আপাততঃ রক্ষা পায়। কিন্তু এর ফলে চীন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির আধা-উপনিবেশে পরিণত হয়।

॥ **তাইপিং বিদ্রোহ (১৮৫৩)** ॥ চীনে যখন বিদেশী রাষ্ট্রগুলির অবাধ লুণ্ঠন ও শোষণের পালা চলছিল তখন মাঞ্চু রাজারা চীনের শাসক ছিলেন। চীনের এই দুর্দশার জন্য চীনা জনসাধারণ মাঞ্চু রাজাদের দায়ী করে। মাঞ্চু শাসক ও বিদেশীদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ দিন দিন বাড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত চীনের জনগণ অপদার্থ মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। এই বিদ্রোহ 'তাইপিং বিদ্রোহ' নামে পরিচিত। বিদ্রোহীরা হাং সিন-চুয়াং নামে একজন নেতার অধীনে একটি নিজস্ব সরকার গঠন করে। এরপর বিদ্রোহীরা নানকিং দখল করে সেখানে রাজধানী স্থাপন করে। এগারো বছর ধরে নানকিং বিদ্রোহীদের দখলে থাকে। মাঞ্চু রাজারা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য বিদেশীদের সাহায্য নিতে বাধ্য হন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে তাইপিং বিদ্রোহ সম্পূর্ণভাবে দমন করা হয়।

॥ **একশত দিনের সংস্কার (১৮৯৮ খ্রীঃ)** ॥ চীনের যে সব অঞ্চলে ইউরোপীয়রা বাস করত সেখান থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতা, শিক্ষা-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রভৃতি চীন দেশের মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। খ্রীষ্টান মিশনারীরা ধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রচারেও বিশেষ ভূমিকা

নেয়। ক্রমশঃ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি চীনাদের আগ্রহ বাড়ে। আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে চীনা ছাত্ররা লেখাপড়া করতে যায়। ইতিমধ্যে চীন-জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে চীনাদের ধারণা হয় যে, জাপানের জয়লাভের মূলে রয়েছে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও যুদ্ধপদ্ধতি। কাজেই চীনে সংস্কার আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। এই সময় চীনা সম্রাট কাংসু কাংউ-ওয়ে নামে একজন নেতার পরিকল্পনা অনুসারে এক ব্যাপক সংস্কারের কর্মসূচী ঘোষণা করেন। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাশ্চাত্য প্রথায় জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, বিদেশ ভ্রমণ, বিদেশী সাহিত্যের অনুবাদ, পাশ্চাত্য রীতি অনুযায়ী সৈন্যবাহিনী গঠন. পরিবহণ ও আর্থিক উন্নতির জন্য রেলপথ স্থাপন প্রভৃতি এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল। এই সংস্কারকে "গৌরবময় একশত দিনের সংস্কার" বলা হয়। কিন্তু রাজমাতা জু সি ছিলেন এই সংস্কারের চরম বিরোধী। তাঁর চক্রান্তে সম্রাট কাংসুকে বন্দী করা হয় এবং এই সংস্কারগুলি বাতিল করা হয়। এইভাবে একশত দিনের সংস্কার ব্যর্থ হয়। চীনের রাজসভায় পুনরায় প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা কায়েম হয়।

॥ বক্সার বিদ্রোহ (১৯০০ খ্রীঃ) ॥ সংস্কার আন্দোলনের ব্যর্থতা চীনা জনসাধারণকে চরম বিক্ষুব্ধ করে তোলে। অপরদিকে বিদেশী বণিকদের চীন সাম্রাজ্য গ্রাস ও বাণিজ্য প্রসার অবাধে চলতে থাকে। এর ফলে চীনে আবার এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই বিদ্রোহকে 'বক্সার বিদ্রোহ' বলা হয়। 'আই হো-চুয়ান' বা একটি মুষ্টিযোদ্ধা সমিতি' এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিল বলে একে 'বক্সার বিদ্রোহ' বলা হয়। বিদ্রোহীদের উদ্দেশ্য বিদেশীদের কবল থেকে চীনকে মুক্ত করা। প্রথম দিকে এই বিদ্রোহ মাঞ্চু বংশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। কিন্তু রাজমাতা কু সি বিদেশীদের উচ্ছেদ করার জন্য বিদ্রোহীদের গোপনে সাহায্য করেন। ফলে বিদ্রোহের গতিপ্রকৃতি অন্যরকম হয়।

বিদ্রোহীরা বিভিন্ন জায়গায় বিদেশী বণিক, পদস্থ কর্মচারী এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির সেনাবাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে। ইউরোপীয় দেশগুলি এই বিদ্রোহের জন্য চীনের কাছে প্রচুর ক্ষতিপূরণ আদায় করে। এছাড়া বিদেশীদের আরও নানা ধরনের সুযোগ-সুবিধা দিতে হয়। রাজমাতা জু সি এবং অন্যান্য পদস্থ কর্মচারীরা পালিয়ে যান। উত্তর চীনে বিদেশী সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়।

॥ সম্রাজ্ঞী জু সি-র প্রতিক্রিয়া ও সংস্কার প্রচেষ্টা ॥ বক্সার বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ায় চীনে সংস্কার-বিরোধী ও বিদেশী-বিরোধী দলের পরাজয় ঘটে। পিকিং-এ বিদেশী সেনাবাহিনী প্রবেশ করায় সংস্কারপন্থীরা চীনকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ছাড়া রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের জয়লাভে চীনবাসীদের শিক্ষা হয়। তারাও জাপানের মত নানা সংস্কারের মাধ্যমে চীনকে শক্তিশালী দেশে পরিণত করতে চায়। অপরদিকে বিধবা সাম্রাজ্ঞী জু সি মাঞ্চুরাজবংশকে রক্ষা করার জন্য সংস্কার প্রবর্তন করতে বাধ্য হন। জু সি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারে উৎসাহ দেন। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য হাজার হাজার ছাত্রকে জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়। বহু উপাসনাগৃহ বিদ্যালয়ে পরিণত করা হয়। রেলপথ নির্মাণ প্রকল্পের দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটান হয়। এ ছাড়াও পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সেনাবাহিনী গঠন, আফিমের ব্যবসা নিষিদ্ধ করা, চীনে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি বিষয়গুলি এই সংস্কার-কর্মসূচীর মধ্যে থাকে। কিন্তু ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রাজমাতা জু সি-র মৃত্যুর পর চীনে আবার গোলযোগ দেখা দেয়।

॥ চীন বিপ্লব (১৯১১) ও মাঞ্চুরাজাদের পতন ॥ রাজমাতা জু সি-র মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মাঞ্চুবংশের পতন আসন্ন হয়ে ওঠে। জু সি প্রবর্তিত

সংস্কার পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদের সন্তুষ্ট করতে পারে না। তাঁরা বুঝতে পারে যে, মাঞ্চুবংশের পতন না ঘটলে চীনের উন্নতি সম্ভব নয়। এইভাবে চীনে মাঞ্চুবংশ-বিরোধী এক শক্তিশালী দল গড়ে ওঠে। এই দলের নেতা ছিলেন সান ইয়াৎ-সেন। সান ইয়াৎ-সেন দক্ষিণ চীনে ক্যান্টনকে কেন্দ্র করে এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি গণতান্ত্রিক বিপ্লবে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি কুয়োমিন্‌তাঙ নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির জন্য 'বিন পাও' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। জু সি ও সম্রাট কাংসুর মৃত্যুর পর একজন নাবালক সম্রাট চীনের সিংহাসনে বসেন। এই সুযোগে কুয়োমিন্‌তাঙ দল শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সান ইয়াৎ-সেন

চীনে কর-বন্ধ আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। এই অবস্থায় মাঞ্চু রাজারা নিজেদের বাঁচানোর জন্য আরও কিছু শাসন সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু সান ইয়াৎ-সেন আপসের পথে না গিয়ে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। সৈন্যবাহিনীর একটি অংশও বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়। বিদ্রোহীরা নানকিং শহর দখল করে এবং সেখানে একটি অস্থায়ী প্রজাতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সান ইয়াৎ-সেন এই প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। চীনের নাবালক সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন। চীনে মাঞ্চুরাজবংশের অবসান ঘটে।

॥ প্রজাতান্ত্রিক চীন: সান ইয়াৎ-সেন ও ইউয়ান সি-কাই ॥ প্রজাতান্ত্রিক সরকারের রাষ্ট্রপতি সান ইয়াৎ-সেনকে চীনের নরমপন্থী সংস্কারবাদীগণ মেনে নিতে পারে না। এই অবস্থায় সান ইয়াৎ-সেন দেশের রাজনৈতিক ঐক্যের স্বার্থে এবং প্রজাতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য পদত্যাগ করেন। তাঁর জায়গায় ইউয়ান সি-কাই নামে একজন প্রাক্তন মাঞ্চুসেনাপতি রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত হন।

॥ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে জাপানের উত্থান ॥ এশিয়া মহাদেশের পূর্বদিকে অবস্থিত জাপান একটি ছোট দেশ। জাপানীরা একে বলত '**নিপ্পন**' বা 'উদীয়মান সূর্যের দেশ'। জাপানের শাসন-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগের মত সামন্ততান্ত্রিক। **মিকোডো** বা সম্রাট নামেমাত্র সম্রাট ছিলেন। আসল শাসনক্ষমতা ছিল 'সোগান' নামে অভিজাত পরিবারের হাতে। 'সোগান,' 'দাইমিও' ও 'সামুরাই' এই তিন শ্রেণীর অভিজাতরা রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষমতা ভোগ করত। বিদেশীদের এরা সন্দেহের চোখে দেখত। কাজেই উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত চীনের মত জাপানও বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল।

মার্কিন সেনাপতি কমোডোর পেরীই সর্বপ্রথম জাপানের দরজা খোলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জাপানীদের কাছ থেকে দুটি বন্দর ব্যবহারের এবং ব্যবসার সুযোগ আদায় করেন। আমেরিকার দেখা-দেখি ক্রমশঃ ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি জাপানের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি করে। চীনের মত জাপানেও বিদেশীরা অবাধ বাণিজ্য ও অতিরাষ্ট্রিক অধিকার লাভ করে। এই সমস্ত অসম্মানজনক চুক্তি জাপানীদের ক্ষুব্ধ করে।

॥ মেজিযুগের সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ॥ জাতির এই অপমানের ফলে জাপানের রাজনীতিতে এক বিরাট পালাবদল শুরু হয়। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীরা 'সোগান'কে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেয়। রাষ্ট্রের যাবতীয় শাসনক্ষমতা দিয়ে সম্রাট মুৎসুহিটোকে পুনরায় জাপানের সিংহাসন বসানো হয়। সম্রাটের রাজত্বকালকে 'মেজি' নামকরণ

করা হয়। জাপানের ইতিহাসে এই ঘটনাকে 'মেজিযুগে সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা' বলা হয়।

॥ **পাশ্চাত্য পদ্ধতিতে সংস্কার** ॥ সোগানের পতন ও সম্রাটের ক্ষমতালাভ জাপানে এক নতুন যুগের সূচনা করে। জাপানীরা বুঝতে পারে যে, বিদেশী শক্তিগুলির মোকবিলা করতে হলে পাশ্চাত্য ভাবধারায় দেশকে উন্নত ও শক্তিশালী করতে হবে। কাজেই সংস্কারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। ইউরোপের অনুকরণে জাপানের নতুন সংবিধান ও আইনকানুন রচনা করা হয়। দ্রুত শিল্পায়ন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ, বড় বড় কলকারখামা নির্মাণ, মুদ্রা সংস্কার, ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থা, কৃষিতে পুঁজি নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়ের উপর জোর দেওয়া হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে সমস্ত প্রথার অবসান ঘটনা হয়। সোগান, সামুরাই ও দাইমিও—এই তিন শ্রেণীর সমস্ত রকমের সুযোগসুবিধা কেড়ে নেওয়া হয়। ভূমি ব্যবস্থার কতকগুলি সংস্কারসাধন করা হয়। জাপানীরা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা হয়। বিদ্যালয়গুলিতে ইংরেজী ভাষা অবশ্যপাঠ্য করা হয়। জাপানী সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী ব্রিটিশ পদ্ধতিতে গঠন করা হয়। এইভাবে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সংস্পর্শে আসার মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে জাপান একটি আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাপানের এই আমূল পরিবর্তনে ইয়ামোগাতা, ইটো, ওকুমা প্রভৃতি ব্যক্তির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ **জাপানী সাম্রাজ্যবাদের সূচনা** ॥ রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন এবং সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে জাপানের পররাষ্ট্রনীতিরও পরিবর্তন শুরু হয়। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে অপমানজনক চুক্তিগুলি বাতিল করার জন্য জাপান আলাপ-আলোচনা চালায়। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। এই অবস্থায় জাপান পশ্চিমী দেশগুলির মত সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ গ্রহণ করে। এ ছাড়া দেশে খুব বেশী

জনসংখ্যার চাপ এবং শিল্পপ্রসারের জন্য খনিজ সম্পদের অভাব প্রভৃতি কারণেও জাপানের সাম্রাজ্যবিস্তার অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ চীন-জাপান যুদ্ধ (১৮৯৪-৯৫ খ্রীঃ) ॥ জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার হয় চীন। ইউরোপের দেশগুলির মত জাপানও চীনের কাছে বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দাবি করে। জাপান ফরমোজা আক্রমণ করে এবং লুচু দ্বীপপুঞ্জ দখল করে। ইতিমধ্যে কোরিয়ার অধিকার নিয়ে জাপানের সঙ্গে চীনের বিবাদ শুরু হয়। কোরিয়া চীন সাম্রাজ্যের দখলে ছিল। কিন্তু রাশিয়া এখানে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কোরিয়ায় রাশিয়ার প্রভাব জাপানের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল। কাজেই কোরিয়ায় জাপান তার ক্ষমতা বিস্তারের চেষ্টা করে। এর ফলে চীন-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে চীন শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। সিমনোসেকির সন্ধি অনুযায়ী চীন জাপানকে ফরমোজা দ্বীপ এবং লিয়াও টুং উপদ্বীপ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ জাপানকে প্রচুর অর্থ দিতে হয়। বিদেশী রাষ্ট্রগুলির মত জাপানও চীনে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা লাভ করে। এই যুদ্ধে জয়লাভের মধ্য দিয়ে জাপান স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে, এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের আসরে জাপান মোটেই কমতি নয়। চীনের মত জাপান পশ্চিম শক্তিগুলির প্রভুত্ব মেনে নিতে মোটেই রাজী নয়।

॥ ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী (১৯০২ খ্রীঃ) ॥ চীন-জাপান যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করলেও জাপানের এগিয়ে চলার পথে প্রধান বাধা ছিল রাশিয়া। রাশিয়ার চাপে জাপান চীনের হাতে লিয়াও টুং উপদ্বীপ এবং পোর্ট আর্থার ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। এছাড়া মাঞ্চুরিয়াকে কেন্দ্র করেও রাশিয়া ও জাপানের বিবাদ শুরু হয়। অপরদিকে এই অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তার ইংল্যাণ্ডও ভালো চোখে দেখে না। কাজেই এই অঞ্চলের রাশিয়াকে বাধা দেওয়ার জন্য ইংল্যাণ্ড ও জাপানের মধ্যে ইঙ্গ-জাপান মৈত্রীচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ইউরোপের একটি বড় শক্তির সঙ্গে এশিয়ার একটি দেশ এই প্রথম সমান মর্যাদায়

ভিত্তিতে সন্ধি করে। এই সন্ধির ফলে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপানের যথেষ্ট প্রভাব বাড়ে।

॥ রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯৫০ খ্রীঃ)॥ ব্রিটিশের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে জাপান এবার রাশিয়াকে মাঞ্চুরিয়া থেকে সৈন্য সরানোর জন্য চাপ দেয়। উভয় পক্ষে বেশ কিছুদিন ধরে আলাপ-আলোচনা চলে। কিন্তু রাশিয়া সৈন্য সরাতে রাজী হয় না। বরং কোরিয়াতেও রাশিয়ার সেনাবাহিনী প্রবেশ করে। এই অবস্থায় জাপান কোরিয়া আক্রমণ করলে রুশ-জাপান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে জাপানের জয় হয়। এই প্রথম এশিয়ার একটি ছোট দেশের কাছে ইউরোপের এক বড় শক্তির পরাজয় ঘটে। পোর্টস্‌মাউথের সন্ধিতে রাশিয়া জাপানকে লিয়াও টুং উপদ্বীপ ও পোর্ট আর্থার বন্দর ছেড়ে দেয়। চীনকে মাঞ্চুরিয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয় এবং কোরিয়াতে জাপানের প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া হয়। রুশ-জাপান যুদ্ধে জয়লাভের ফলে জাপানের যথেষ্ট মর্যাদা বাড়ে। ইউরোপীয় শক্তিগুলির সঙ্গে সমানতালে জাপানও সাম্রাজ্য বিস্তারের আসরে নেমে পড়ে। প্রতিবেশী দেশ চীনকেই জাপান প্রথম আঘাত করে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র কোরিয়া জাপানের দখলে আসে।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানের একুশ দফা দাবি ॥ ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইউরোপের দেশগুলি তখন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। এই সুযোগে জাপান চীনে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়িয়ে চলে। ইংল্যাণ্ডের বন্ধু হিসেবে জাপান জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং চীনে জার্মানির দখল-করা দুটি অঞ্চল কিয়াও চাও ও শান টুং প্রদেশ অধিকার করে। ১৯-৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীনের কাছে 'একুশ-দফা দাবি' পেশ করে। পাঁচটি ভাগে বিভক্ত এই দাবিগুলির মধ্যে ছিল চীনের অনেকগুলি অঞ্চল দখল করার প্রস্তাব, নানা ধরনের বাণিজ্যের সুযোগ, জাপানী জিনিসপত্র কিনতে বাধ্য করা, চীনে জাপানী পরামর্শদাতা নিয়োগ প্রভৃতি। যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে জাপান বেশীর ভাগ দাবিই আদায় করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জাপান হয় এশিয়ার শ্রেষ্ঠ শক্তি।

একাদশ অধ্যায়

● ব্রিটিশ রাজের শাসনে ভারতবর্ষ (১৮৫৮-১৯১৪)

॥ নতুন শাসনব্যবস্থা ॥ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন অনুসারে এদেশে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন শেষ হয়। ইংল্যাণ্ডের মহারানীর হাতে ভারতের শাসনভার অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্যদের মধ্যে নিযুক্ত একজন ভারত সচিবকে ভারতের শাসন পরিচালনার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ব্রিটিশ রাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভারতের গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। ব্রিটিশ ভাইসরয়দের মধ্যে লর্ড ক্যানিং, লর্ড লিটন, লর্ড রিপন ও লর্ড কার্জনের শাসনকাল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য ভাইসরয়দের মধ্যে ছিলেন স্যার জন লরেন্স, লর্ড মেয়ো, লর্ড ডাফরিন, লর্ড এলগিন, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রমুখ।

॥ লর্ড ক্যানিং (১৮৫৬-১৮৬২) ॥ ভারতের প্রথম ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং শাসনব্যবস্থায় অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার করেন। রাজস্বের ঘাটতি দূর করার জন্য তিনি আয়কর ও আমদানি শুল্ক চালু করেন। রাজস্ব আইনের দ্বারা কতকগুলি শর্তের ভিত্তিতে জমির উপর প্রজাদের স্বত্ব মেনে নেওয়া হয়। তাঁর সময়ে কাগজের নোট চালু হয়। এ ছাড়া ফৌজদারী আইনবিধি রচনার কাজ এই সময়ে শেষ হয়। কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করে হাইকোর্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। লর্ড ক্যানিং সরকারী কাজগুলি এক একজন সদস্যের মধ্যে ভাগ করে দেন, এবং এইভাবে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় ক্যাবিনেট প্রথার গোড়াপত্তন হয়।

॥ লর্ড লিটন ॥ (১৮৭৬-১৮৮০) ॥ শাসনব্যবস্থায় লর্ড লিটন

বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেন। এদেশে দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য তিনি একটি দুর্ভিক্ষ কমিশন নিয়োগ করেন। এছাড়া ভবিষ্যতে দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি মোকাবিলা করার উদ্দেশ্যে দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য প্রসার, জলসেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও রেললাইনের প্রসার প্রভৃতি ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতির জন্য নানাধরনের শুল্ক তুলে দেওয়া হয়। প্রদেশের সরকারগুলিকে প্রাদেশিক রাজস্বের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে সরকার-বিরোধী কোন সংবাদ ছাপানো আইন করে বন্ধ করেন।

॥ লর্ড রিপন (১৮৮০-১৮৮৪) ॥ ভারতের ইতিহাসে লর্ড রিপন একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তিনি ছিলেন উদারনীতির সমর্থক। ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁর গভীর সহানুভূতি ছিল। তিনি দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্যের প্রসার ঘটান এবং আমদানি ও লবণ শুল্ক কমিয়ে দেন। লিটনের আমলের সংবাদপত্র আইন বাতিল করে সংবাদপত্রগুলিকে তিনি স্বাধীন মতামত প্রকাশের অনুমতি দেন। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য তিনি স্যার উইলিয়াম হাণ্টারের নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করেন। বিচার ব্যবস্থায় ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে বৈষম্য দূর করার জন্য তিনি 'ইলবার্ট বিল' নামে এক আইনের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ইউরোপীয়দের আন্দোলনের ফলে এই বিল তুলে নিতে হয়। কলকারখানায় শ্রমিকদের সুবিধার জন্য তিনি কারখানা আইন চালু করেন। রিপনের শাসন সংস্কারের ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতবাসীকে তিনি স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেন। জেলা বোর্ড এবং লোকাল বোর্ড স্থাপন করে এইগুলির উপর স্থানীয় শিক্ষা, রাস্তাঘাট, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হয়। শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের উপযুক্ত শিক্ষাদান করাই ছিল লর্ড রিপনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য তিনি ভারতবাসীর মনে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হন।

॥ **লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫)** ॥ প্রশাসনিক দক্ষতা ও কৃতিত্বের জন্য লর্ড কার্জনকে ব্রিটিশ ভাইসরয়দের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়। রাজস্বের হার নির্দিষ্ট করা এবং আদায় করার বিষয়ে তিনি উদারনীতি অবলম্বন করেন। তাঁর সময়েই সর্বপ্রথম চাষীদের অল্প সুদে ঋণ দেওয়ার জন্য সমবায় সমিতি গঠিত হয়। তিনি সরকারী কৃষি বিভাগ স্থাপন করেন এবং কৃষি ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগে উৎসাহ দেন। শিল্প ও বাণিজ্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি পৃথক শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগ গঠন করা হয়। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারী অধীনে আনার জন্য তিনি 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাস করেন। প্রাচীন সৌধ, অট্টালিকা প্রভৃতি পুরাকীর্তি সংরক্ষণেরও তিনি সুব্যবস্থা করেন। দেশীয় রাজাদের পুত্রদের নিয়ে তিনি একটি বিশেষ সামরিক বাহিনী গঠন করেন। প্রশাসনের ক্ষেত্রে লর্ড কার্জনের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হয় বাংলাদেশকে দুভাগে ভাগ করা। তাঁর এই কুখ্যাত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে 'বঙ্গভঙ্গ' আন্দোলন শুরু হয়।

লর্ড কার্জন

॥ **ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তার** ॥ ভারতবর্ষ সরাসরিভাবে ব্রিটিশ শাসনে আসার পর মহারানী ভিক্টোরিয়া এক ঘোষণাপত্রে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার বন্ধ করার নীতি ঘোষণা করেন। কিন্তু এই সময় থেকে পরবর্তী কয়েক বৎসর পর্যন্ত ভারত সরকার দেশের সীমান্তে অবস্থিত রাজ্যগুলির সাথে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়। প্রকৃতপক্ষে এই যুগকে ব্রিটিশ রাজের 'সাম্রাজ্যবাদী' যুগ হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এক সময়ে ভুটান, আফগানিস্থান, ব্রহ্মদেশ ও

তিব্বত প্রভৃতি সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির শিকার হয়।

॥ ভুটান ॥ ভারতে আসার কিছুদিন পরেই স্যার জন লরেন্স ভুটান রাজ্য আক্রমণ করেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন। সন্ধির শর্ত অনুসারে ভুটানরাজ বাৎসরিক করের বিনিময়ে ডুয়ার্স অঞ্চলটি ব্রিটিশের হাতে অর্পণ করেন।

॥ **আফগানিস্থান** ॥ প্রথম ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীর পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সরকার আফগানিস্থানের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার পক্ষপাতী ছিলেন না। আফগানিস্থানের আমীর দোস্ত মহম্মদের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র শের আলি ও ব্রিটিশ ভাইসরয়দের মধ্যে মোটা-মুটি স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় ছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী লর্ড লিটনের আমলে এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। লিটনের উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্থানকে দুর্বল করে রাশিয়ার প্রভাব থেকে মুক্ত করা। হিরাটে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগের প্রশ্ন নিয়ে শের আলি ও লিটনের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে শের আলি ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হলে লর্ড লিটন শের আলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই ভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৭৮ খ্রীঃ)। যুদ্ধে আফগানগণ পরাজিত হয়। শের আলির মৃত্যু হওয়ায় তাঁর পুত্র ইয়াকুব খাঁ ও ব্রিটিশের মধ্যে 'গানদামুকের সন্ধি' স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধি দ্বারা কাবুলে একজন ব্রিটিশ রেসিডেন্ট নিয়োগ করা হয়, এবং আফগানিস্থানের পররাষ্ট্রনীতি ব্রিটিশের অধীনে আনা হয়। এই অপমানজনক সন্ধির বিরুদ্ধে আফগানগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করায় পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। আফগানগণ পরাজিত হয়। পরবর্তী ভাইসরয় লর্ড রিপনের প্রচেষ্টায় ইঙ্গ-আফগান সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

॥ তিব্বত ॥ চীনের আশ্রিত রাজ্য তিব্বতের শাসনকর্তাকে দালাইলামা বলা হত। ব্রিটিশের প্রতি তিব্বতীদের মনোভাব ভালো ছিল না। তিব্বতীরা সিকিম রাজ্য আক্রমণ করলে ব্রিটিশের হাতে

পরাজিত হয়। এর পর তিব্বত ও ব্রিটিশের মধ্যে দুটি বাণিজ্য চুক্তি হয়। কিন্তু তিব্বতীরা এই চুক্তি মানতে রাজী হয় না। ইতিমধ্যে দালাইলামা রাশিয়ার বৌদ্ধ ভিক্ষু দোরজিয়েফের মাধ্যমে রাশিয়ার সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। তিব্বতে রাশিয়ার প্রভাব বিস্তারের আশংকায় লর্ড কার্জন কর্নেল ইয়ং হাজব্যাণ্ডকে তিব্বতে পাঠান। তিব্বতীরা ব্রিটিশদূতকে প্রবেশ করতে বাধা দিলে উভয় পক্ষে যুদ্ধ হয়। ইয়ং হাজব্যাণ্ড তিব্বতের রাজধানী লাসা দখল করেন। তিব্বতীগণ ব্রিটিশের সাথে লাসার সন্ধি (১৯০৪ খ্রীঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়। সন্ধির শর্ত অনুসারে তিব্বতের বাণিজ্য ও রাজনীতিতে ব্রিটিশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষ পর্যন্ত সন্ধির কয়েকটি শর্ত বাতিল করা হয়।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে উত্তর ব্রহ্ম বাদে সারা ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশের উত্তর ভাগে ব্রিটিশের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ ছিল না। ফলে ব্রিটিশ বণিকেরা উত্তর ব্রহ্ম অধিকারের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দেয়। ইতিমধ্যে ব্রহ্মরাজ থিবো ফরাসীদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির দ্বারা ব্রহ্মদেশে ফরাসীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় ব্রহ্মদেশে ফরাসী প্রভাব বিস্তার হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার আশংকা প্রকাশ করেন। ঠিক এই সময়ে ব্রহ্মরাজ থিবো একটি ব্রিটিশ বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানকে সামান্য কারণে জরিমানা করেন। এই ঘটনায় ব্রহ্মরাজ ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে তীব্র বিরোধের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধকে কেন্দ্র করে তৃতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয় (১৮৮৫ খ্রীঃ)।। ব্রহ্মরাজ থিবো পরাজিত হন এবং উত্তর ব্রহ্ম ব্রিটিশের দখলে আসে।

॥ উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কার আন্দোলন ॥ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বিদেশী ইংরেজ কোম্পানীর সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এদেশের রাজনীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন হয়। অপরদিকে এই

একই সময়ে ইংরেজী শিক্ষা চালু হওয়ায় ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এক আলোড়নের সৃষ্টি হয়। পুরনো সাবেকী চিন্তাভাবনার পরিবর্তে শিক্ষিত ভারতবাসী যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে। এই যুক্তিবাদী চিন্তাধারা ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। ধর্ম ও সমাজের ক্ষেত্রে নানা ধরনের অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতিও দূর করার জন্য এদেশে সংস্কার আন্দোলন শুরু হয়।

॥ ধর্ম সংস্কার আন্দোলন ॥ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ভারতীয় সমাজে স্বাভাবিক কারণেই ধর্ম-সংস্কার প্রথমে শুরু হয়। হিন্দুধর্মকে কুসংস্কার-মুক্ত করার জন্য রাজা রামমোহন রায় যে আন্দোলন শুরু করেন ক্রমশঃ তার থেকে ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলনের প্রসার ঘটে। পরবর্তী সময়ে ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন এবং শিবনাথ শাস্ত্রী। এছাড়া 'পরমহংস সমাজ' এবং কেশব সেনের উদ্যোগে 'প্রার্থনা সমাজ' নামে মহারাষ্ট্রে দুটি ধর্মসংস্থা গড়ে ওঠে। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ভারতে এক জাতি, এক ধর্ম ও এক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য 'আর্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সাধারণ মানুষের উপযোগী গল্প-কথার মধ্য দিয়ে হিন্দুধর্মের আসল রূপ প্রচার করেন। তাঁর ধর্মমতকে ভারতবর্ষে ও দেশের বাইরে প্রচার করেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। হিন্দুধর্মের পাশাপাশি সারাৎ উল্লাহ্ ও সৈয়দ আহম্মদের নেতৃত্বে ইসলাম ধর্ম সংস্কারের জন্য 'ওয়াহাবী আন্দোলন' শুরু হয়।

রাজা রামমোহন

॥ **সমাজ-সংস্কার আন্দোলন** ॥ ধর্ম সংস্কারের পাশাপাশি সমাজ সংস্কার আন্দোলন দ্রুত প্রসার লাভ করে। এ যুগের সামাজিক আন্দোলনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা। মৃত স্বামীর সঙ্গে একই চিতায় স্ত্রীকে দাহ করাকে সতীদাহ প্রথা বলা হত। রাজা রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টায় এই কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়। এছাড়া বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ ও বাল্যবিবাহ প্রথার বিলোপ, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, জাতিভেদ প্রথার উচ্ছেদ, পর্দাপ্রথার বিলোপ, শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি প্রগতিশীল সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। সমাজ সেবা ও জনসাধারণের নৈতিক উন্নয়নে রামকৃষ্ণ মিশন যথেষ্ট উদ্যোগ নেয়। অনেক যুক্তিবাদী ভারতীয় মনীষীও সমাজ সংস্কারে ব্রতী হন। বাংলা দেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার হন। পণ্ডিত বিষ্ণুশাস্ত্রী ও মাধব গোবিন্দ রানাডের প্রচেষ্টায় মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সফল হয়। স্ত্রী-শিক্ষার প্রসারও সমাজ-সংস্কারের অন্যতম কর্মসূচী ছিল। খ্রীষ্টান মিশনারীগণ, রাজা রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মিঃ ড্রিঙ্ক ওয়াটার বেথুন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ মনীষিগণ এ বিষয়ে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। অপরদিকে দাসপ্রথা, গঙ্গায় শিশু বিসর্জন, স্ত্রী-শিশু হত্যা প্রভৃতি কুপ্রথাগুলি দূর করার জন্যও শিক্ষিত ভারতবাসী ইংরেজদের সহযোগিতা করেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

॥ জাতীয় চেতনার বিকাশ ও প্রসার ॥ আধুনিক ভারতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল জাতীয় চেতনার বিকাশ ও প্রসার। পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে যুক্তিবাদ ও স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব, ইটালী ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য আন্দোলন প্রভৃতি বিদেশী ঘটনা ভারতবাসীকে দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে সচেতন করে তোলে। অপরপক্ষে মিল্টন, মিল, বেন্থাম প্রভৃতি মনীষীদের রচনা-পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষিত ভারতবাসী জাতীয়তাবোধ ও গণতন্ত্রের আদর্শে অনুপ্রাণিত হন। ইতিমধ্যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণা শুরু হওয়ায় স্বদেশের প্রতি দেশবাসীর মনে শ্রদ্ধাবোধ জাগে। ব্রিটিশ শাসনে ভারতের সর্বত্র একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা চালু হওয়ায় ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগও একই রকম হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে ওঠায় বিভিন্ন অংশের মানুষের মধ্যে জাতীয় ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। এছাড়া ব্রিটিশ কর্মচারীদের উদ্ধত আচরণ, সরকারের জনবিরোধী আইন-কানুন, সরকারী চাকরির উচ্চ পদগুলিতে ভারতীয়দের নিয়োগে বাধাদান প্রভৃতি বিষয়গুলি ভারতবাসীকে বিক্ষুব্ধ করে। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বয়স না কমানো এবং একই সঙ্গে ভারতে ও ইংল্যাণ্ডে পরীক্ষা গ্রহণের দাবিতেই সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠে। স্থরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' এবিষয়ে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে। এর পর স্থরেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টায় 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স' নামে একটি জাতীয় সভা গঠন করা হয়। জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি জাতীয় তহবিলও গঠিত হয়। বাংলাদেশের বাইরেও 'বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এসোসিয়েশন', 'মহাজন সভা', 'পুনা সার্বজনিক সভা' প্রভৃতি জাতীয় সভা-সমিতি গড়ে ওঠে।

॥ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ॥ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই বৎসরই অ্যালান অক্টাভিয়ান

হিউম নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ কর্মচারীর উদ্যোগে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জির সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে। উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী একই রকম হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কনফারেন্স জাতীয় কংগ্রেসের সাথে মিশে যায়। ১৯০৫ খ্রীঃ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ মূলতঃ দুটি নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। একটি হল, সরকারী কার্যকলাপ ও নীতির সমালোচনা, অপরটি সংস্কার দাবি। প্রথমদিকে কংগ্রেস ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় ছিল। কারণ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় শাসক শ্রেণীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত ভারতবাসীকে ব্রিটিশ-বিরোধী রাজনীতি থেকে দূরে সরিয়ে রাখা। কিন্তু কংগ্রেসের সংগঠন এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। অবশ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রথম কুড়ি বৎসর কংগ্রেসী আন্দোলন দাবি আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদন রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

॥ **চরমপন্থী আন্দোলনের প্রসার (১৯০৫-১৯১৪)** ॥ কংগ্রেসী আন্দোলনের আপসপন্থী মনোভাব ও আবেদন-নিবেদনের রাজনীতিতে নবীন সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হন। এই গোষ্ঠী আবেদন-নিবেদনের পরিবর্তে সক্রিয় আন্দোলনের পথকে সমর্থন করেন। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় ও বিপিনচন্দ্র পালের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী চরমপন্থীগোষ্ঠী নামে পরিচিত হয়। অপর পক্ষে ব্রিটিশ রাজের শাসন ও শোষণ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য একদল যুবকের মনে সংগ্রামী চেতনার বিকাশ ঘটে। তাঁরা সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা দেশকে মুক্ত

বালগঙ্গাধর তিলক

করার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেন। এইভাবে চরমপন্থী রাজনীতি দুটি ধারায় প্রবাহিত হয়—একটি প্রতিরোধ আন্দোলনের পথ, অপরটি সশস্ত্র সংগ্রামের পথ।

সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে প্রথম গুপ্ত সমিতি মহারাষ্ট্রের বলবন্ত ফাদকের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশে বিপ্লবী আন্দোলন অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ ও উল্লাসকর দত্ত প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। এখানে অনুশীলন সমিতি এবং যুগান্তর নামে দুটি সমিতি স্থাপিত হয়। বিপ্লবীদের লক্ষ্য ছিল অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের হত্যা করা ও প্রশাসন ব্যবস্থা বিকল করা। এই উদ্দেশ্যে ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামক দুজন যুবককে অত্যাচারী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করার দায়িত্ব দেওয়া হয়। তাঁরা ভুল করে অন্য গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন। প্রফুল্ল চাকী গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম গ্রেপ্তার হন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসী হয়। পুলিস অরবিন্দসহ বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করে। বিচারে অনেকের সাজা হয়। এরপর এই অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঢাকার অনুশীলন সমিতির নেতা পুলিন দাস। তার পর থেকে নতুন সদস্য সংগ্রহ, অস্ত্র সংগ্রহ, রাজনৈতিক ডাকাতি, ব্রিটিশ অফিসার হত্যা প্রভৃতি বিক্ষিপ্তভাবে চলতে থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের

বিপিন চন্দ্র পাল

ক্ষুদিরাম বসু

সময় কলকাতা বন্দর থেকে রডা কোম্পানীর কয়েক বাক্স পিস্তল ও রিভলভার বিপ্লবীদের হাতে আসে। বাংলাদেশের বাইরেও বিপ্লব প্রচেষ্টা চলতে থাকে। মহারাষ্ট্রে বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নেতৃত্বে 'মিত্রমেলা' ও 'অভিনব ভারত' নামে দুটি বিপ্লবী সমিতি গড়ে ওঠে। নাসিকের জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন। পাঞ্জাবের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন হরদয়াল ও ভাই পরমানন্দ। রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জ হত্যার পরিকল্পনা হয়। তাঁর নেতৃত্বে সারা উত্তর ভারত জুড়ে ব্রিটিশ বিরোধী উত্থানের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। ভারতের বাইরে বিপ্লবী সংস্থা গঠনে শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা, সাভারকর, মদনলাল ধিংড়া প্রমুখ বিপ্লবীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বর্তমান শতাব্দীর এক যুগান্তকারী ঘটনা। দীর্ঘ চার বৎসর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল। এই ধরনের ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে কখনো ঘটেনি। পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি দেশ এই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধ কোনও একটি মাত্র কারণে ঘটেনি। এর পেছনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেকগুলি কারণ ছিল।

পরোক্ষ কারণ ঃ

॥ উগ্র জাতীয়তাবাদ ॥ জাতীয়তাবাদ জাতির জীবনে কাম্য। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ এক জাতির সাথে অপর জাতির বিদ্বেষ ও তিক্ততা বাড়িয়ে তোলে। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই উগ্র জাতীয়তাবাদ ইউরোপের রাজনীতিকে বিষাক্ত করে। ফ্রান্স, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি দেশ আপন জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে ওঠে। তারা পরস্পর পরস্পরকে শত্রু ভাবতে শুরু করে। প্রতিটি দেশ অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যাপক সামরিক প্রস্তুতি করে। সমগ্র ইউ-রোপের এই উগ্র জাতীয়তাবাদী ও জঙ্গীবাদী দৃষ্টিভঙ্গী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে।

॥ পরস্পর-বিরোধী শক্তিজোট ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম প্রধান কারণ হ'ল ইউরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির জোট বাঁধার প্রবণতা। জার্মানির চান্সেলার বিসমার্কের উদ্যোগে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও ইটালীর মধ্যে ত্রি-শক্তি জোট গড়ে ওঠে। অপর পক্ষে ফ্রান্স, রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ড পরস্পর মিলিত হয়ে ত্রিশক্তি আঁতাত গঠন করে। এইভাবে ইউরোপে দুটি পরস্পর-বিরোধী সামরিক জোট গড়ে ওঠে। দুই জোটের রেষারেষি বিশ্বশান্তিকে বিপন্ন করে।

॥ **বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ** ॥ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধও বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। বল্কান অঞ্চলে স্লাভ জাতিগুলির কর্তৃত্ব করা নিয়ে রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সেডানের যুদ্ধে জার্মানির কাছে ফ্রান্সের পরাজয় ও আলসেস-লোরেন নামক দুটি অঞ্চল জার্মানিকে ছেড়ে দেওয়ার বেদনা ফ্রান্স ভুলতে পারে না। ফলে ফরাসী-জার্মান বিরোধ বাড়তে থাকে। জার্মানির সাম্রাজ্য বৃদ্ধির প্রচেষ্টা ব্রিটেনের মনে আশঙ্কার সৃষ্টি করে। ফলে ব্রিটেন ও জার্মানির মধ্যে চূড়ান্ত রেষারেষি শুরু হয়। নিকট-প্রাচ্যের রাজনীতি নিয়ে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয়। বল্কান অঞ্চলে সার্বিয়াকে কেন্দ্র করে অস্ট্রিয়া-সার্বিয়া বিরোধ চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে।

॥ **জার্মানির উচ্চাকাঙ্ক্ষা** ॥ জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম ছিলেন ঘোরতর সাম্রাজ্যবাদী। জার্মানির সাম্রাজ্য-লিপ্সা ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া জার্মান সম্রাটের সামরিক শক্তির অহংকার সারা বিশ্বে আতংকের সৃষ্টি করে।

॥ **উপনিবেশের লড়াই** ॥ ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে স্বার্থ-সংঘাত ও মিত্রজোট গঠনের মূল কারণ ছিল উপনিবেশ বিস্তার। শিল্পোন্নত বিভিন্ন দেশগুলির উপনিবেশ বিস্তার এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতার ফলেই যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। কাজেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ দায়ী করা যায় না।

॥ **প্রত্যক্ষ কারণ** ॥ ইউরোপের রাজনৈতিক আবহাওয়া এইভাবে পারস্পরিক রেষারেষি, বিদ্বেষ ও তিক্ততায় বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় (১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন) বসনিয়ার রাজধানী সেরাজোভা শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিনাণ্ড নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের জন্য অস্ট্রিয়া সার্বিয়াকে দায়ী করে, এবং সার্বিয়ার কাছে এক চরমপত্র পাঠায়। এই চরমপত্রের সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে (২৮শে জুলাই, ১৯১৪)।

রাশিয়া সার্বিয়ার পক্ষে যোগদান করলে জার্মানিও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'ত্রিশক্তি আঁতাত' জোটের ফ্রান্স রাশিয়ার পক্ষ নেয়। বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে জার্মানি ফ্রান্স আক্রমণ করায় ইংল্যাণ্ড জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। এর পর একে একে তুরস্ক ও বুলগেরিয়া জার্মানির পক্ষে এবং ইটালী, চীন, জাপান, আমেরিকা মিত্রপক্ষে অর্থাৎ ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়ার পক্ষে যোগ দেয়।

॥ বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে 'সর্বাত্মক যুদ্ধ' বলা হয়। কারণ জল, স্থল ও আকাশে একই সঙ্গে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধের প্রথম দুই বৎসর জার্মানিই আক্রমণকারীর ভূমিকা গ্রহণ করে। মার্নের যুদ্ধেই প্রথম জার্মানির গতিরোধ করা সম্ভব হয়। কিন্তু টানেনবার্গের যুদ্ধে রাশিয়া জার্মানির কাছে পরাজিত হয়। অস্ট্রিয়া-জার্মানির আক্রমণে সার্বিয়া আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। গ্যালিপলি ও ইপ্রেসের যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় ঘটে। কুট-এল-আমারার যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনী তুরস্কের কাছে পরাজয় বরণ করে। কিন্তু ভার্দুন ও জাটল্যাণ্ডের যুদ্ধে জার্মান বাহিনী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিত্রপক্ষে যোগদান করায় যুদ্ধের গতি পাল্টে যায়। এর পর তুরস্ক, বুলগেরিয়া, অস্ট্রিয়া একে একে পরাজিত হয়। ইতিমধ্যে জার্মানিতে বিদ্রোহ দেখা দিলে কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জার্মানি বিনা শর্তে মিত্র পক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। এইভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ হয়।

॥ বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ছিল বিরাট। যুদ্ধশেষে প্রতিটি রাষ্ট্রেই আর্থিক সংকট দেখা দেয়। এছাড়া খাদ্যাভাব ও মহামারী ব্যাপক আকার ধারণ করে। কিন্তু সব দিক থেকে বিচার করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে একটি যুগান্তকারী বিপ্লব বলা চলে। এই যুদ্ধে জয়লাভ জাতীয়তাবাদের জয়যাত্রা ঘোষণা করে।

এক জাতি, এক রাষ্ট্র—এই নীতির ভিত্তিতে ইউরোপে নতুন নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়।

এশিয়ায় চীন, তুরস্ক ও মিশরে জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটে। আয়ারল্যাণ্ডে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হয়। জাতীয়তাবাদের পাশাপাশি গণতন্ত্রেরও প্রসার ঘটে। জার্মানি, অস্ট্রিয়া, তুরস্ক, গ্রীসে রাজাদের যুগ শেষ হয়। এইসব দেশে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। রাশিয়ায় জার শাসনের অবসানে সাম্যবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার ইটালী, জার্মানি, স্পেন প্রভৃতি রাষ্ট্রে একনায়কতন্ত্রের সূচনা হয়। সামাজিক জীবনেও এই যুদ্ধের বিরাট প্রভাব ছিল। যুদ্ধের সময় শ্রমিকদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় তারাও রাজনীতিতে অংশ নেয়। নেতাদের দাবীদাওয়া পূরণের জন্য বিভিন্ন দেশে শ্রমিক কল্যাণ আইন পাস করা হয়। পুরুষেরা যুদ্ধে যাওয়ায় মেয়েদের বাইরের কাজকর্মও করতে হয়। ফলে সমাজে মেয়েদের মর্যাদা বাড়ে। যুদ্ধের ফলে 'লীগ-অব্-নেশনস্' ও 'তৃতীয় ইণ্টারন্যাশনাল' প্রভৃতি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতবর্ষ ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকেও যুদ্ধরত দেশ বলে ঘোষণা করে। নিজেদের স্বার্থের তাগিদে তারা ভারতবর্ষের ধনসম্পদ, খাদ্য, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম, কাঁচামাল, খনিজদ্রব্য প্রভৃতি যুদ্ধের কাজে লাগায়। খুব কম সময়ের মধ্যে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

॥ ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় ভারতীয় সমর্থন ॥ কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগে থেকেই ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অনুকূলে ছিল না। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক নীতি এদেশের শিল্প বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করায় দেশীয় বড় বড় শিল্পপতিরা ব্রিটিশ-বিরোধী ছিলেন। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক অংশ ব্রিটিশের সাথে আপসের নীতি গ্রহণ করে

চলেছিলেন ঠিকই ; কিন্তু শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ স্বদেশকে বিদেশী শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য বৈদেশিক শক্তির কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু সেই সময় ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস। কাজেই যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করা ব্রিটেনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় শিল্প বিকাশের সুযোগ দেওয়ার জন্য সব রকমের আমদানি করা শিল্প-সামগ্রীর উপর শুল্ক আরোপ করেন। সেই সঙ্গে একথাও ঘোষণা করা হয় যে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারকে যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করলে যুদ্ধ-শেষে ভারতীয়দের স্বায়ত্ত শাসন দেওয়া হবে। শাসক-শ্রেণীর পক্ষ থেকে অর্থ নৈতিক সুবিধা দান এবং রাজনৈতিক স্বায়ত্ত শাসনের আশ্বাস দানের ফলে জাতীয় নেতাগণ ব্রিটেনের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দানের নীতি গ্রহণ করেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি আনুগত্য ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সাহায্য দানের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এমনকি চরমপন্থী নেতা লোকমান্য তিলকও ঘোষণা করেন যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা প্রতিটি ভারতবাসীর আশু কর্তব্য। গান্ধীজীও ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যুদ্ধে যোগদানের জন্য ভারতবাসীদের প্রতি আবেদন জানান। বলা বাহুল্য যে এই সব জাতীয় নেতৃবৃন্দ প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ শিল্পপতি ও আপসপন্থী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন।

॥ **অর্থ নৈতিক সংকট ও ব্যাপক গণ-অসন্তোষ** ॥ ভারতবর্ষ ছিল ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর অবাধ লুণ্ঠন ক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এই লুঠের মাত্রা বেড়ে যায়। বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠানো ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যয়ভার ভারতবাসীকে বহন করতে হয়। ভারতীয়দের ওপর এক বিরাট মোটা অংকের 'যুদ্ধ-ঋণ' চাপানো হয়। তাড়াছা

যুদ্ধের খরচা বাবদ এক বিপুল পরিমাণ অর্থ ভারতবাসীর কাছ থেকে বাধ্যতামূলক 'ভেট' হিসেবে আদায় করা হয়। ফলে বিশ্বযুদ্ধ ভারতবাসীকে এক চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে ঠেলে দেয়। অপর দিকে বিদেশী এবং দেশীয় শিল্পপতিরা নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে তোলেন। যুদ্ধের সময় 'টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল কোম্পানী' ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে পরিণত হয়। শিল্পপতিদের মুনাফার অংক ফুলে-ফেঁপে ওঠে। কলকারখানায় শ্রমিকশ্রেণীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। তাদের মজুরিও বাড়ে। কিন্তু মজুরির তুলনায় জিনিষপত্রের দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়ে ওঠে। অপর দিকে কুটির শিল্প ভেঙে পড়ায় এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত এক বিরাট অংশ আর্থিক দুর্দশায় পড়ে। শ্রমিক, কৃষক এবং সাধারণ মানুষের দূরবস্থা চরম সীমায় ওঠে। এর ফলে ব্যাপক গণ-অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে রাশিয়ার বিপ্লবের বার্তা ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের মধ্যে দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। জনসাধারণের সামনে তা এক নতুন আলোর দীপালোক প্রজ্বলিত করে।

ভারতবাসীর আর্থিক সংকটের জন্য জনসাধারণের সঙ্গে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরোধ ক্রমশঃ তীব্র হয়ে ওঠে। অপর পক্ষে জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে।

॥ স্বদেশেও বিদেশে বৈপ্লবিক সংগ্রাম ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন জড়িয়ে পড়ার ফলে সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার বিপ্লব-প্রচেষ্টা দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ে। স্বদেশে ও বিদেশে এই প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের বিপ্লবীরা বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করে ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, এবং নরেন্দ্রনাথ ভট্টচার্য বা মানবেন্দ্রনাথ

রায়। ইংরেজদের প্রধান শত্রু জার্মানির সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য মানবেন্দ্রনাথ রায় বাটাভিয়ায় যান। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি থেকে 'মাভেরিক' ও আরও দুটি জাহাজে অস্ত্রশস্ত্র বালেশ্বরে আনার খবর পেয়ে বাঘা যতীন কয়েকজন সহকর্মীদের নিয়ে বালেশ্বরে হাজির হন। কিন্তু এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে পড়ে। ব্রিটিশ পুলিস বাহিনী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তার করতে গেলে বাঘা যতীনের নেতৃত্বে মাত্র পাঁচজন বিপ্লবী ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে বুড়িবালাম নদীর তীরে প্রচণ্ড লড়াই চালান। ভারতবর্ষের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাসে এই লড়াই এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

বাঘা যতীন

এই একই সময়ে পাঞ্জাব সহ সমগ্র উত্তর ভারতের বিপ্লবীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু। রাসবিহারী বসু বেনারসের শচীন সান্যাল ও মহারাষ্ট্রের পিংলার সহযোগিতায় সারা উত্তর ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই বিপ্লব প্রচেষ্টা 'লাহোর ষড়যন্ত্র' নামে পরিচিত। আমেরিকায় স্থাপিত 'গদর-পার্টি'র বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত ও ভারতে আগত এক বিরাট সংখ্যক পাঞ্জাবীও সেই 'ষড়যন্ত্রে'র অন্যতম শরিক ছিলেন।

রাসবিহারী বসু

এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত বিপ্লবীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন পৃথ্বী সিং, পণ্ডিত পরমানন্দ, কর্তার সিং, ভাই পরমানন্দ, বিনায়ক গণেশ পিংলা, জগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবীগণ। ভারতবর্ষে এই সমস্ত বিপ্লব প্রচেষ্টা মূলতঃ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এর সঙ্গে শ্রমিক-কৃষক ও জনসাধারণের যোগ ছিল না বললেই চলে। কেবলমাত্র পাঞ্জাবে 'গদর-পার্টির' প্রচেষ্টায় কৃষক সম্প্রদায়ের এক অংশের মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা-চেতনার কিছুটা বিস্তার ঘটেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতবর্ষের বাইরে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ সংগঠনের ব্যাপক প্রচেষ্টা শুরু হয়। এই বিপ্লব প্রচেষ্টায় 'গদর-পার্টির' ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কালিফোর্নিয়ায় ভারতীয় ছাত্ররা 'ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিপ্লবী লালা হরদয়ালের পরামর্শ অনুযায়ী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মে এই সঙ্ঘের নাম পরিবর্তন করে 'গদর-পার্টি' রাখা হয়। 'গদর' শব্দের অর্থ বিপ্লব। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করাই ছিল এই পার্টির প্রধান উদ্দেশ্য। 'গদর-পার্টির' উদ্যোগে হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী ও গুজরাটি ভাষায় 'গদর' নামে এক পত্রিকা প্রকাশিত হয় এবং তা নিয়মিতভাবে ভারতীয়দের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

হরদয়াল আমেরিকা থেকে চলে গিয়ে প্রথমে সুইজারল্যাণ্ড ও পরে বার্লিনে আসেন এবং বার্লিনে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। গদর-পার্টি বিশ্বযুদ্ধকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পক্ষে একটি বিরাট সুযোগ বলে মনে করে। গদর পার্টির নেতাগণ ভারতবর্ষে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করার জন্য ভারতীয় কৃষকদের নিয়ে একটি বাহিনী গঠন করায় সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে পাণ্ডুরঙ্গ খানখোজে, বিষণ দাস এবং আগাছে ওরফে 'মহম্মদ আলি' প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ভারতের পথে রওনা হন। তাঁরা বেলুচিস্থানে এসে এক হাজার

বালুচ কৃষকদের নিয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর সাহায্যে ইংরেজ সেনাদের পরাজিত করেন এবং একটি 'স্বাধীন সরকার' গঠন করেন। কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই সরকারের পতন ঘটে।

বিশ্বযুদ্ধে গ্রেট ব্রিটেন জার্মানির বিপক্ষে থাকায় প্রবাসী ভারত-বাসীরা জার্মানির সহযোগিতায় ভারতের স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন। প্রবাসী ভারতীয়দের পক্ষে ভূপেন্দ্র নাথ দত্ত, খানচাঁদ বর্মা এবং আরও কয়েকজন এই বিষয়ে সক্রিয় হন। কিন্তু মূলতঃ বিপ্লবী বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের ব্রিটিশ-বিরোধী কার্যকলাপে সাহায্য ও সহ-যোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের শেষ-দিকে বার্লিনে 'ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। এই কমিটি ছাড়াও 'ভারতবন্ধু জার্মান-সমিতি' নামেও আর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। 'ভারতীয় বিপ্লবী কমিটি' বা সংক্ষেপে 'বার্লিন কমিটি' বাংলাদেশের বিপ্লবীদের জন্য প্রচুর অর্থ পাঠান। ভারতীয় বিপ্লব সফল করার জন্য 'আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করা হয়। বিপ্লবীরা ব্রহ্মদেশ ও ভারত আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করা সম্ভব হয় না। কিন্তু ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরে ভারতীয়

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং সাতদিন পর্যন্ত সিঙ্গাপুর শহর নিজেদের দখলে রাখতে সমর্থ হয়।

'বার্লিন কমিটি'র উদ্যোগে পারস্যদেশে সৈয়দ টাক্‌জাদের নেতৃত্বে একটি 'ভারতীয় কমিটি' গঠন করা হয়। এছাড়া তুরস্ক, আমেরিকা মেক্সিকো প্রভৃতি স্থানেও 'বার্লিন কমিটি'র শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। চীন ও জাপানে বিপ্লবী ঘাঁটি স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হলেও তা বাস্তবায়িত হয় না।

বিশ্বযুদ্ধের সময় আফগানিস্থানের কাবুলে স্বাধীন ভারতের এক অস্থায়ী সরকার গঠন করা হয়। এই সরকার গঠনের প্রধান প্রধান নায়ক ছিলেন লালা হরদয়াল, বরকতুল্লা, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। কিন্তু বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের জয়লাভ এই প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন অনেক প্রবাসী ভারতীয় নাগরিক বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেন। গুরুদিত সিং-এর নেতৃত্বে একটি ভারতীয় দল জাপান থেকে 'কোমাগাটামারু' নামে একটি জাহাজ ভাড়া করে বজবজে এসে পৌছায়। ব্রিটিশ সরকার তাদের পাঞ্জাবে পাঠিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলে তাঁরা তা অমান্য করেন। ফলে পুলিস গুলি চালায়। আট জন শিখ নিহত হন। এই ঘটনা 'কোমাগাটামারু' ঘটনা নামে পরিচিত।

॥ **হোম-রুল আন্দোলন** ॥ বিশ্বযুদ্ধ-প্রসূত আর্থিক সংকটের ফলে জনজীবন বিপন্ন হয়ে পড়ে এবং এই সংকট থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রাম দানা বাঁধতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের এই চরম বিপদের দিনে মাদ্রাজে 'থিওসোফিক্যাল সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাত্রী অ্যানি বেশান্ত ভারতের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ভারতবাসীকে সংগ্রামের পথ থেকে সরিয়ে এনে শান্তিপূর্ণ পথে আন্দোলন পরিচালনা করার জন্য তিনি সচেষ্ট হন। তাঁর এই প্রচেষ্টাই 'হোম-রুল' আন্দোলনের আকার নেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে ধ্বংস না করে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়দের আনুগত্য

প্রকাশ করানোই ছিল এই আন্দোলসের মূল লক্ষ্য। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভই ছিল এই আন্দোলনের মূল কথা। অ্যানি বেশান্ত এই আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 'কমন উইল' ও, নিউ ইণ্ডিয়া' নামে দুটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময় বাল গঙ্গাধর তিলক জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এই আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পুনা শহরে 'হোম-রুল লীগ' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর পর থেকে তিলক এবং বেশান্ত একযোগে সারা ভারত জুড়ে হোম-রুল আন্দোলন

অ্যানি বেশান্ত

গড়ে তোলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সংগে 'হোম-রুল দিবস' পালন করা হয়। ইতিমধ্যে তিলক ও বেশান্তের উপর সরকারী আক্রমণ নেমে আসে। কিন্তু বেশান্তের প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। তিনি তাঁর পত্রিকা মারফত হোম-রুলের দাবী প্রচার করতে থাকেন।

॥ লক্ষ্ণৌ চুক্তি ॥ বিশ্বযুদ্ধের প্রথম থেকেই ভারতের হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায় চরম দুর্দশার মধ্যে থাকায় তাদের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী গণবিক্ষোভ প্রবল আকার ধারণ করে। কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতাগণ এই গণবিক্ষোভে আশংকিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনের দাবি নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করেন। অপরপক্ষে মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দও ভারতের পক্ষে উপযোগী স্বায়ত্ত-শাসনের দাবির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের অধিবেশনে হোম-রুল দাবির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যন্ত ১৯১৬

খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে বিখ্যাত লক্ষ্ণৌ-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস মুসলিম লীগের পৃথক নির্বাচনের দাবি মেনে নেয়। অপরপক্ষে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের 'স্বরাজ' আদর্শ মেনে নিতে সম্মত হয়। এইভাবে কংগ্রেস-লীগের যৌথ কর্মসূচি ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিকে উপেক্ষা করে জাতীয় আন্দোলনকে স্বায়ত্তশাসন লাভের শান্তিপূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত করে।

॥ রাওলাট আইন ॥ ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের বিরতি ঘোষণা হয়। যুদ্ধের শোষণে ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক দুর্দশা চরম সীমায় ওঠে। সারা ভারতব্যাপী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ চলাকালীন প্রবর্তিত ভারত-রক্ষা আইনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়। কাজেই ভারতবাসীর আন্দোলন দমন করার জন্য আর একটি কালা কানুনের প্রয়োজন হয়। রাওলাট কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ রাওলাট আইন পাস করা হয়। এই আইনের বলে সন্দেহমাত্র কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও নির্বাসন, বিশেষ কোন অঞ্চলকে আইন-শৃংখলা ভঙ্গকারী বলে ঘোষণা করা, ভারতীয়দের প্রতি নানা বিধি-নিষেধ আরোপ করা প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সোজা কথায় রাওলাট আইনের বলে বিপ্লবী দমনের অজুহাতে ভারতবাসীর ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করার কালা কানুন গৃহীত হয়।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ॥ রাওলাট আইন পাস হওয়ায় ভারতব্যাপী বিক্ষোভ শুরু হয়। গান্ধীজী এই আইনের প্রতিবাদে সারা দেশব্যাপী হরতাল পালন করার আহ্বান জানান। রাওলাট আইনের প্রতিবাদে যে গণ-আন্দোলনের শুরু হয় তার চরম পরিণতি ঘটে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল পাঞ্জাবের গভর্নরের নির্দেশে পাঞ্জাবের দুই জনপ্রিয় নেতা ডঃ সত্যপাল ও ডঃ কিচলিউ নির্বাসিত হন। জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সারা অমৃতসর উত্তাল হয়ে ওঠে।

এই অবস্থায় জেনারেল ডায়ারকে পাঞ্জাবের শাসনভার অর্পণ করা হয়। ১২ই এপ্রিল জেনারেল ডায়ারের নির্দেশে অমৃতসরে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ করা হয়। পরের দিন ১৩ই এপ্রিল ছিল বৈশাখী মেলা। এই মেলা উপলক্ষেই অমৃতসরের একদল বাসিন্দা জালিয়ান-ওয়ালাবাগে মিলিত হয়। জেনারেল ডায়ার তাঁর সৈন্যসামন্ত ও কামান-বন্দুক নিয়ে এখানে হাজির হন। তাঁর নির্দেশে বেপরোয়া-ভাবে নিরস্ত্র নরনারীর উপর গুলী চালানো হয়। সহস্রাধিক নরনারী ও শিশু নিহত হয়। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ফলে সমগ্র ভারতে ইংরেজ বিদ্বেষ ও ঘৃণার বন্যা বয়ে যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই ঘটনার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি বর্জন করেন।

॥ **মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কারের প্রস্তাব** ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ব্রিটিশ সরকার ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেন। কাজেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় শাসন সংস্কারের দাবি নতুন করে মাথাচাড়া দেয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ যৌথ-ভাবে শাসন সংস্কারের একটি পরিকল্পনা পেশ করে। নরমপন্থী নেতা গোপাল কৃষ্ণ গোখলেও একটি আলাদা প্রস্তাব পেশ করেন। এই অবস্থায় ভারত সচিব মণ্টেগু ও ভাইসরয় চেমসফোর্ড ভারতে শাসন সংস্কারের একটি রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন সংস্কার আইন পাস করা হয়। এই আইন মণ্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার নামে পরিচিত। কিন্তু এই শাসন সংস্কার ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসনের দাবি পূরণে ব্যর্থ হয়।

॥ **মুসলিম অসন্তোষ** ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের জার্মানির পক্ষে যোগদান এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ভারতীয় মুসলমানদের সামনে এক অদ্ভুত সমস্যার সৃষ্টি করে। তুরস্কের সুলতান ছিলেন মুসলিম জগতের খলিফা বা ধর্মগুরু। কাজেই তুর্কীদের প্রতি মুসলমানদের স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ সহানুভূতি ছিল। ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের মনোভাবের কথা জানতেন। তাই যুদ্ধের পর

তুরস্কের ব্যাপারটি বিবেচনা করার আশ্বাস দেওয়া হয়। কিন্তু যুদ্ধশেষে এই আশ্বাস কার্যকরী করা হয় না। তুরস্ক সাম্রাজ্য ভাগবাঁটোয়ারা করা হয় এবং খলিফা পদচ্যুত হন। তুরস্কের প্রতি ব্রিটিশের এই আচরণ ভারতীয় মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ করে। তারা ব্রিটেনের তুরস্ক নীতি পরিবর্তনের দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত।

॥ অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব ॥ মুসলমান পরিচালিত খিলাফৎ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা লাভ করে। তিনি ভারতবর্ষের 'স্বরাজ' গঠনের প্রশ্নেও খিলাফৎ সমস্যার উপর একই ধরনের রাজনৈতিক গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলনে গান্ধীজী সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনে স্থির হয় যে তুরস্কের সমস্যা সমাধান না হলে সরকারের বিরুদ্ধে বয়কট ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা হবে। ইতিমধ্যে গান্ধীজী-প্রকাশিত একটি ইস্তাহারে খিলাফতীদের ভবিষ্যৎ কর্মসূচীর কথা ঘোষণা করা হয়। এই ইস্তাহারেই ঐতিহাসিক অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের রণকৌশল প্রথম বর্ণিত হয়।

॥ জাতীয় নেতা হিসেবে গান্ধীজীর আবির্ভাব ॥ ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ একটি গুরুত্বপূর্ণ বছর। এই বছরেই গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ও জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের চরম দুর্দশা জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন প্রবাহের জন্ম দেয়। এই প্রবাহ সৃষ্টির অন্যতম নায়ক ছিলেন গান্ধীজী। খিলাফতীদের সমর্থনে, সরকারী দমননীতি, রাওলাট আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায় | রুশ বিপ্লব

বর্তমান শতাব্দীর ইউরোপ তথা আধুনিক বিশ্বের ইতিহাসে রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লব বা রুশ বিপ্লব একটি অন্যতম স্মরণীয় ঘটনা। ফরাসী বিপ্লবের পর ইতিহাসে এই রকম যুগান্তকারী ঘটনা আর ঘটেনি। এই বিপ্লবকে একাধারে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপ্লব বলা যায়। ফরাসী বিপ্লব প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে নতুন ব্যবস্থার সূচনা করেছিল রুশ বিপ্লবে তারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটে। কিন্তু এই বিপ্লব কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। ফরাসী বিপ্লবের মতই এই বিপ্লবের পেছনে নানা কারণ ছিল।

পরোক্ষ কারণ:

॥ রাজনৈতিক ॥ রাশিয়ার সম্রাটদের জার বলা হত। তাঁরা সকলেই স্বৈরাচারী শাসক ছিলেন। জনসাধারণের কোন রাজনৈতিক অধিকার ছিল না। জার অভিজাতদের পরামর্শ মত শাসনকার্য চালাতেন। রাশিয়ায় ধর্ম ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল না। সরকার-বিরোধী কার্যকলাপের জন্য বিনা বিচারে আটক ও সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হত। প্রকাশ্য আন্দোলন করার কোন উপায় না থাকায় জারের বিরুদ্ধে দেশে একাধিক সন্ত্রাসবাদী দল গড়ে ওঠে। রাশিয়ায় বসবাসকারী অন্যান্য জাতির উপর জোর করে রুশ-ভাষা ও সংস্কৃতি চাপানো হয়। ফলে এরাও জার শাসনের বিরোধী হয়ে ওঠে। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রেও জাররা ব্যর্থ হন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয় জারদের অপদার্থতা ও দুর্বলতা প্রমাণ করে। জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লব শুরু হয়। কিন্তু জার দ্বিতীয় নিকোলাস এই বিপ্লব থেকে কোন শিক্ষা নেননি। ফরাসী সম্রাট ষোড়শ-লুই-এর মত তিনিও তাঁর রানী আলেকজান্দ্রার

কথামত চলতেন। রানী আলেকজান্দ্রা চলতেন রাসপুটিন নামে একজন সন্ন্যাসীর পরামর্শে। কাজেই রাসপুটিনের পরামর্শমত জার দ্বিতীয় নিকোলাস দেশে যথেচ্ছাচার চালাতে থাকেন। জারের এই স্বেচ্ছাচার রুশবিপ্লবের পথ প্রশস্ত করে।

॥ **সামাজিক** ॥ রাশিয়ার সমাজ ব্যবস্থার উচ্চস্তরে ছিল অভিজাত সম্প্রদায়। নিম্নস্তরে ছিল সার্ফ বা কৃষক সম্প্রদায়। সংখ্যায় খুব কম হলেও অভিজাতরাই সব রকমের মর্যাদা ও অধিকার ভোগ করত। অভিজাত শ্রেণীই ছিল অধিকাংশ জায়গা-জমির মালিক। সার্ফ বা ভূমিদাসদের 'মির' বা গ্রাম্য সমিতির অত্যাচার সহ্য করতে হত। কৃষকদের অবস্থার উন্নতির জন্য কোন ব্যবস্থা না হওয়ায় কৃষক সম্প্রদায় প্রায়ই অভিজাত জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত।

কৃষকদের মত শিল্প-শ্রমিকদের অবস্থাও খুব শোচনীয় ছিল। মালিক শ্রেণী নিজেদের মুনাফার জন্য শ্রমিকদের নির্মমভাবে শোষণ করত। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে, নামমাত্র মজুরিতে শ্রমিকদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাজ করতে হত। কাজের অভাবে বহু শ্রমিক বেকার জীবন যাপন করতে বাধ্য হত। কারখানায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ ছিল। এই সব কারণে শ্রমিক সম্প্রদায় জার শাসনের প্রতি ক্রমশঃ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শ প্রচার এই বিক্ষোভকে ব্যাপক শ্রমিক আন্দোলনে পরিণত করে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে রাশিয়ার কলকারখানায় প্রায়ই শ্রমিক ধর্মঘট লেগে থাকে।

॥ **অর্থনৈতিক** ॥ রাশিয়ার অর্থ নৈতিক সংকটও রুশ বিপ্লবের জন্য দায়ী ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁয়া হয়। কয়লার আমদানিতে ঘাটতি পড়ায় কলকারখানা এবং পরিবহণ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ে। সৈন্য বিভাগে কৃষকদের যোগদান বাধ্যতামূলক করায় কৃষিকার্যের চরম ক্ষতি হয়। ফলে সেনাবিভাগে

এবং শহর অঞ্চলে ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দেয়। এই রকম জটিল পরিস্থিতিতে রুশ বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে।

॥ মানসিক কারণ॥ ফ্রান্সের মত রাশিয়াতেও টুর্গেনিভ, টলস্টয়, গোর্কি, ডস্টয়েভস্কি প্রমুখ সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের রচনা অপদার্থ জারের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে দারুণ ঘৃণার সৃষ্টি করে। বাকুনিনের রচনা ও কার্ল মার্কসের সাম্যবাদী আদর্শ বুদ্ধিজীবীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে। বলশেভিক বিপ্লবীদের মুখপত্র 'প্রাভদা' পত্রিকাও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চিন্তা-ভাবনার খোরাক যোগায়।

প্রত্যক্ষ কারণ ঃ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হাতে রাশিয়ার পরাজয় এবং দারুণ খাদ্যাভাবের ফলে দেশের সর্বত্র গণবিক্ষোভ শুরু হয়। কৃষকগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করে। শ্রমিক সম্প্রদায় লাগাতার ধর্মঘটের সামিল হয়। রুশ সৈন্যবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে চলে আসতে থাকে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পেট্রোগ্রাড শহরে শ্রমিকগণ ধর্মঘট শুরু করে। জারের সেনা বাহিনী ধর্মঘট দমন না করে শ্রমিকদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এই অবস্থায় মার্চ মাসে জার দ্বিতীয় নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। রাশিয়ায় একটি অস্থায়ী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জারতন্ত্রের পতন ঘটে এবং রুশ বিপ্লবের প্রথম পর্ব শেষ হয়।

॥ নভেম্বর বিপ্লব ॥ জারের পতন ঘটলেও মার্কসের আদর্শ অনুযায়ী সর্বহারার শাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় না। অপরপক্ষে অস্থায়ী সরকারের শাসন নীতি জনসাধারণকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। পুনরায় অভিজাত শ্রেণীর সম্পত্তি লুট, শ্রমিক ধর্মঘট ও সৈন্যদের যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ শুরু হয়। এই সুযোগে বিপ্লবীদের 'মেনশেভিক' শাখার নেতা কেরেনস্কী ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু জনসাধারণ এই সরকারের প্রতিও আস্থাশীল ছিল না। এদিকে বিপ্লবী 'বলশেভিক' দল

কেরেনস্কী সরকারের পতন ঘটিয়ে সর্বহারার রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সংকল্পবদ্ধ হয়।

রাশিয়ায় এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বলশেভিক দলের নেতা লেনিন রাশিয়ায় ফিরে আসেন। লেনিন ছাত্র থাকাকালীন মার্কসবাদী দর্শনে অনুপ্রাণিত হন। তিনি বলশেভিকদের কাছে তাঁর বিখ্যাত 'এপ্রিল থিসিস' বা 'এপ্রিল মাসের ঘোষণা' পেশ করেন। ঘোষণার মূল শ্লোগান ছিল তিনটি—'জমি, শান্তি ও রুটি'। অর্থাৎ ক্ষমতা দখল করার পর বলশেভিকরা কৃষকদের দেবে জমি, যুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবে এবং শ্রমিক-দের খাদ্য দেবে। লেনিনের এই ঘোষণা দেশব্যাপী এক অভূতপূর্ব সাড়া জাগায়। লেনিনের দুই প্রধান সহ-যোগী জোসেফ স্তালিন ও ট্রাট্স্কীর উদ্যোগে বলশেভিক দলের তৎপরতা বাড়ে। অবশেষে ৭ই নভেম্বর (১৯১৭ খ্রীঃ) বলশেভিক স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে গঠিত 'লাল ফৌজের' সাহায্যে কেরেনস্কী সরকারের পতন ঘটানো হয়। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক বিপ্লব সফল হয়। রাশিয়ার মাটিতে সর্বপ্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

লেনিন

॥ বলশেভিক বিপ্লবের প্রভাব ॥

॥ রাশিয়ায় ॥ ইউরোপ তথা বিশ্বের ইতিহাসে বলশেভিক বিপ্লব একটি নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এই বিপ্লবের ফলে রাশিয়ার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন ঘটে। রাশিয়ার বুকে সর্বপ্রথম সাম্যবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থা

প্রতিষ্ঠিত হয়। জারতন্ত্রের স্বেচ্ছাচার, অভিজাত ও জমিদার সম্প্রদায়ের বিশেষ ক্ষমতা এবং চার্চের ক্ষমতার অবসান ঘটে। দেশের প্রাকৃতিক ও অন্যান্য সমস্ত সম্পদ রাষ্ট্রের বা জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়। ব্যক্তিগত মালিকানা ও ব্যক্তিগত মুনাফার পথ বন্ধ হয়। সমস্ত রকমের শোষণ ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাশিয়ায় এক শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে শ্রম করা বাধ্যতামূলক করা হয়। দেশের শাসনতন্ত্রে কাজের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। রাশিয়া ক্রমশঃ বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হয়।

॥ ইউরোপ ও বিশ্বে ॥ ইউরোপ ও বিশ্বের রাজনীতির ক্ষেত্রেও এই বিপ্লবের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। পশ্চিম ইউরোপের প্রচলিত সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর এই বিপ্লব চূড়ান্ত আঘাত হানে। সামবাদী প্রচারের ফলে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ-গুলিতে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। একদিকে তারা রাশিয়ার বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে, অপরদিকে শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য নানা আইনকানুন পাস করতেও বাধ্য হয়। জার্মানি, ইটালী প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদকে ধ্বংস করার জন্য ফ্যাসিবাদী দল গড়ে ওঠে। সাম্যবাদকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ইউরোপের প্রায় সবদেশে সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়ার দেশগুলিতেও সাম্যবাদী ভাবধারার যথেষ্ট প্রসার ঘটে। চীনদেশেও সাম্যবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়া, আফ্রিকার অনুন্নত দেশগুলির মুক্তি-আন্দোলন রুশ বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়। এ ছাড়া রাশিয়ার পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অনুকরণে বিশ্বের অনগ্রসর দেশগুলিতে অর্থ নৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সবদিক থেকে বিচার করলে রুশ বিপ্লবকে 'মহাবিপ্লব' বলা যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী ইউরোপ (১৯১৯-১৯৩৯)

॥ **প্যারিস শান্তি সম্মেলন ও ইউরোপের পুনর্গঠন** ॥ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিজয়ী শক্তিবর্গের প্রতিনিধিগণ শান্তি স্থাপন ও যুদ্ধপীড়িত ইউরোপের পুনর্গঠনের জন্য প্যারিস নগরীতে মিলিত হন। বত্রিশটি দেশের প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদান করেন। পরাজিত শক্তিবর্গ ও রাশিয়াকে এই বৈঠকে আহ্বান করা হয় না। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেনসো, ইংল্যাণ্ডের, প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ, ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্লাণ্ডো ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন—এই চারজন প্রধান ব্যক্তি এই সম্মেলনে নেতৃত্ব করেন। প্রেসিডেন্ট উইলসন শান্তি প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হিসেবে তাঁর বিখ্যাত 'চৌদ্দ দফা' নীতি পেশ করেন। কিন্তু তাঁর এই নীতি সবক্ষেত্রে কার্যকরী করা হয় না।

॥ **শান্তিচুক্তিসমূহ** ॥ বিজয়ী মিত্রপক্ষের সঙ্গে পরাজিত রাষ্ট্রগুলির পাঁচটি সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। জার্মানির সঙ্গে ভার্সাই সন্ধি, অস্ট্রিয়ার সঙ্গে সেন্ট জার্মেনের সন্ধি, হাঙ্গেরীর সঙ্গে ট্রিয়াননের সন্ধি, বুলগেরিয়ার সঙ্গে নিউলির সন্ধি, তুরস্কের সঙ্গে সেভরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধিগুলিকে একত্রে 'ভার্সাই শান্তি ব্যবস্থা' বলা হয়।

॥ **ভার্সাই সন্ধি** ॥ এই সন্ধিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভার্সাই সন্ধি। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে জার্মানি ফ্রান্সকে আলসেস লোরেন, বেলজিয়ামকে ইউপেন ও ম্যালমেডী, লিথুয়ানিয়াকে মেমেল শহর এবং পোল্যাণ্ডকে পোজেন ও পশ্চিম প্রাশিয়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। জার্মানির ডানজিগ বন্দরটিকে একটি মুক্ত শহরে পরিণত করা হয়। খনিজ অঞ্চল সার উপত্যকাকে ১৫ বৎসরের জন্য ফ্রান্সের অধীনে আনা হয়। এছাড়া জার্মানির উপনিবেশগুলি

মিত্রশক্তির কাছে সমর্পণ করা হয়। জার্মান সেনাবাহিনীতে এক লক্ষের বেশী সৈন্য রাখা এবং বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়। জার্মানি বড় বড় যুদ্ধজাহাজ, অধিকাংশ বাণিজ্য জাহাজ এবং প্রচুর কামান, রেল-ইঞ্জিন ও মোটর ইঞ্জিন মিত্রপক্ষের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়। এ ছাড়াও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ মিত্রপক্ষ জার্মানির কাছে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দাবি করে। জার্মান যুদ্ধ-অপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়।

॥ ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি ॥ ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলির মধ্যে মিত্র-পক্ষের প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সন্ধি জোর করে জার্মানির উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। জার্মানির খনিজ অঞ্চল, উপনিবেশ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক উৎসগুলি কেড়ে নেওয়ার পরও তার উপরে এক বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয়। তার পক্ষে এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া মোটেই সম্ভব ছিল না। জার্মানির সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দিয়ে তাকে পঙ্গু ও দুর্বল করার নীতি গ্রহণ করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই জার্মানির মনে অসন্তোষের সৃষ্টি হয় যা পৃথিবীকে আর এক বিশ্বযুদ্ধের পথে নিয়ে যায়। এই-ভাবে ভার্সাই সন্ধির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত হয়।

॥ **অন্যান্য সন্ধি** ॥ সেণ্ট জার্মেনের সন্ধি দ্বারা অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। অস্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের অংশ নিয়ে স্বাধীন যুগোশ্লাভিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে পোল্যাণ্ড ও রুমানিয়া যথাক্রমে গ্যালিসিয়া ও বুকোভিনা অঞ্চল লাভ করে। ট্রিয়াননের সন্ধি দ্বারা হাঙ্গেরীকে অস্ট্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। হাঙ্গেরীকেও কয়েকটি অঞ্চল রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং চেকোশ্লাভাকিয়া ছেড়ে দিতে হয়। নিউলির সন্ধিতে বুলগেরিয়ার কিছু অংশ গ্রীস ও যুগোশ্লাভিয়াকে দেওয়া হয়। পরাজিত রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকের সৈন্যসংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়। সেভরের সন্ধি দ্বারা তুরস্কের ইউরোপীয় রাজ্যগুলি

গ্রীসকে দেওয়া হয়। এশিয়ার রাজ্যগুলি ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। কিন্তু লসেনের সন্ধি দ্বারা কতকগুলি অংশ তুরস্ক পুনরায় ফিরে পায়।

ইটালীতে ফ্যাসীবাদের উত্থান ঃ

॥ **যুদ্ধ শেষে ইটালীর অবস্থা** ॥ প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ইটালীর প্রধানমন্ত্রী অর্ল্যাণ্ডো বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করলেও ভার্সাই সন্ধি ব্যবস্থা ইটালীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে না। অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে কিছু অঞ্চল লাভ করলেও ডালমেশিয়া উপকূলে ও আলবেনিয়ায় ইটালীকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় না। এছাড়া জার্মানি বা তুরস্কের কাছ থেকে পাওয়া উপনিবেশগুলির কোন অংশ ইটালীর ভাগে পড়ে না। এর ফলে সারা দেশে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। এছাড়া যুদ্ধ শেষে ইটালীতে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। যুদ্ধ শেষ হওয়ায় অনেকে বেকার হয়ে পড়ে। কলকারখানায় উৎপাদন কমে যায়। অতিমাত্রায় কর বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের দুর্দশা বাড়ে। দেশের এই দারুণ সংকট দূর করতে ইটালী সরকার ব্যর্থ হয়। রাজনৈতিক দলাদলি এবং পরস্পরের স্বার্থ সংঘাতের জন্য ইটালীতে দু' বৎসরের মধ্যে ছয়টি মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। এই অবস্থায় সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী প্রচারের ফলে কলকারখানায় ধর্মঘট, কৃষক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী চিন্তাধারার দ্রুত প্রসার ঘটে। সাম্যবাদী দলের উদ্ভবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী আতংকিত হয়। দেশের সংকট মোচন ও শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনেব জন্য তারা ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

॥ **মুসোলিনী ও ফ্যাসীবাদী আন্দোলন** ॥ এই অব্যবস্থা ও অরাজকতার হাত থেকে ইটালীকে রক্ষা করার জন্য বেনিটো মুসোলিনীর আবির্ভাব হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মিলান শহরে 'ফ্যাসিস্ট' দলের প্রতিষ্ঠা করেন। এই দলের সদস্যগণ কালো পোশাক পরত এবং কুচকাওয়াজ করত। ইটালীর সর্বত্র ক্লাব বা সংঘ প্রতিষ্ঠা করে তারা দলের প্রচার কাজ চালায়। দেশে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা

করার প্রতিশ্রুতি এবং সাম্যবাদীদের বিরোধিতা করায় এই দলের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। ক্রমশঃ বেকার যুবক, বেকার সৈনিক, জমিদার এবং পুঁজিপতিরা ফ্যাসীবাদীদের ঘোর সমর্থকে পরিণত হয়। দলের সুগঠিত বাহিনী বামপন্থীদের সভা-সমিতি ভেঙে দেয়, বামপন্থী ও সমাজতন্ত্রী নেতাদের হুমকি দেয়, এমনকি অনেককে হত্যা করে। ফ্যাসীবাদের এই মারমুখী আচরণ তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তারে সাহায্য করে। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে ফ্যাসীবাদী নেতা মুসোলিনী তাঁর অনুগামীদের নিয়ে রোমের দিকে অগ্রসর হন। ইটালীর রাজা তৃতীয় ভিক্টর ইমানুয়েল ভয় পেয়ে মুসোলিনীকে তাঁর প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এরপরে মুসোলিনী বলপ্রয়োগে সমস্ত বিরোধী দলকে দমন করে ইটালীতে পূর্ণ একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। ফ্যাসিবাদ হল গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্যবাদ ও সমাজ-তন্ত্রবিরোধী। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বই প্রধান, ব্যক্তি বা দলের কোন স্থান নেই। 'দুচে' উপাধিতে ভূষিত মুসোলিনী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইটালীর পরাজয় পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন।

বেনিটো মুসোলিনী

জার্মানিতে নাৎসীবাদের উত্থান :

॥ যুদ্ধশেষে জার্মানির অবস্থা ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মান সম্রাট কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম হল্যাণ্ডে পালিয়ে যান। জার্মানিতে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রজাতন্ত্র ওয়েমার প্রজাতন্ত্র নামে পরিচিত। এবার্ট এই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হন। নানা বিষয়ে সাফল্যলাভ করলেও ওয়েমার প্রজাতন্ত্র স্থায়িত্ব লাভ করতে

পারে না। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি জার্মান জাতির মনে যে চরম ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি করেছিল প্রজাতন্ত্রী সরকার তার প্রতিকার করতে পারে না। বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরেই জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থাও শোচনীয় হয়ে ওঠে। মিত্রপক্ষকে প্রচুর ক্ষতিপূরণ দেওয়ায় জার্মানিতে প্রচণ্ড মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রের দাম অস্বাভাবিক রকমে বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের দুর্দশার সীমা থাকে না। প্রজাতন্ত্রী সরকার এই অবস্থার প্রতিকার করতে ব্যর্থ হয়। ইতিমধ্যে সারা পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক সংকট শুরু হয়। জার্মানির অর্থনৈতিক কাঠামো একেবারে ভেঙে পড়ে। শিল্প-বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়ে। উৎপাদন কমে যায়। বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে। ঠিক এই সময়ে প্রজাতন্ত্র-বিরোধী নাৎসী দলের নেতা এডলফ্ হিটলার জার্মানির ক্ষমতা দখল করতে এগিয়ে আসেন।

॥ **হিটলার ও নাৎসী আন্দোলন** ॥ হিটলার জার্মানির মিউনিখ শহরে জাতীয় সমাজতন্ত্রী বা 'নাৎসী' দল গঠন করেন। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল অপমানজনক ভার্সাই সন্ধি বাতিল করা, জার্মান জাতি-দের নিয়ে একটি শক্তিশালী জার্মান রাষ্ট্র গঠন করা, জার্মানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা এবং জার্মানি থেকে ইহুদী ও সাম্যবাদী-দের উৎখাত করা। প্রথমে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ক্ষমতা দখল করার প্রচেষ্টায় হিটলার ব্যর্থ হন। তাঁর কারাদণ্ড হয়। কারাবাসের সময় হিটলার

এডলফ্ হিট্‌লার

তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'মেইন কাম্‌ফ্' বা 'আমার সংগ্রাম' রচনা করেন। কারাদণ্ড শেষ হওয়ার পর হিটলার পুনরায় তাঁর প্রচার কাজ শুরু করেন। মুসোলিনীর 'কালো কোর্তা' বাহিনীর অনুকরণে তিনি একটি 'ঝটিকা বাহিনী' গঠন করেন। জার্মান যুবক সম্প্রদায় এতে দলে দলে যোগ দেয়। ক্রমে মধ্যবিত্ত, চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, দোকানদার, সৈনিক প্রভৃতি নাৎসী দলে যোগদান করে। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে নাৎসী দল জার্মানির আইনসভায় সবচেয়ে বেশী আসন লাভ করে এবং হিটলার জার্মানির প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। কয়েক মাসের মধ্যে হিটলার সাম্যবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের দমন করেন। ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু হলে হিটলার একাধারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী হন। জার্মান সেনাবাহিনীর উপর তাঁর সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। এরপর থেকে তিনি জার্মানির 'ফ্যুয়েরার' নামে পরিচিত হন। ফ্যাসীবাদের মত নাৎসীবাদও ছিল গণতন্ত্র, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সাম্যবাদ ও শান্তি-বিরোধী। নাৎসীরা ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। এই দলের প্রতীক ছিল স্বস্তিকা চিহ্ন। নাৎসী নেতা হিটলার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় পর্যন্ত দেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন।

॥ লীগ অব্ নেশনস্ বা জাতিসংঘ ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি স্থাপনের জন্য লীগ অব্ নেশনস্ বা জাতিসংঘ নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসনের চৌদ্দ দফা প্রস্তাব অবলম্বনে বিশ্বের ছোট-বড় সকল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষা করাই ছিল জাতিসংঘের উদ্দেশ্য। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে জাতিসংঘের সদস্যপদ গ্রহণ করার জন্য আহ্বান করা হয়। সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভা শহরে জতিসংঘের সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের একটি কার্যকরী সমিতি, একটি সাধারণ পরিষদ ও একটি স্থায়ী কর্মদপ্তর ছিল। এছাড়া

রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক বিরোধ মীমাংসার জন্য হেগ শহরে একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপিত হয়। বিশ্বের শ্রমিকদের সমস্যা সমাধান এবং তাদের অবস্থার উন্নতির জন্য একটি আন্তর্জাতিক শ্রমদপ্তর গঠিত হয়।

॥ জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কুড়ি বৎসর জাতিসংঘ অনেকগুলি ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ মীমাংসা করতে সক্ষম হয়। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে প্রায় একশ মামলার সুষ্ঠু নিষ্পত্তি হয়। বিভিন্ন অনগ্রসর দেশের শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্য অনেকগুলি পরিকল্পনা রচনা করা হয়। এ ছাড়া দাস ব্যবসা এবং মাদক দ্রব্য ব্যবসা বন্ধ করা, বিশ্বের সর্বত্র রোগ প্রতিরোধের জন্য স্থায়ী স্বাস্থ্য সংস্থা স্থাপন, যুদ্ধবিধ্বস্ত অঞ্চলে অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, নারীসমাজ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন প্রভৃতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে জাতিসংঘ উল্লেখযোগ্য সাফল্যলাভ করে।

কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সাফল্য খুবই সীমিত ছিল। বড় বড় রাষ্ট্রগুলিকে কেন্দ্র করে যে সকল বিরোধের সৃষ্টি হয় তার কোন মীমাংসা জাতিসংঘ করতে পারে না; জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘ জাপানের কার্যের প্রতিবাদ করে। ফলে জাপান জাতিসংঘ ত্যাগ করে। ইটালী আবিসিনিয়া আক্রমণ করলে জাতিসংঘ ইটালীর বিরুদ্ধে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে পারে না। স্পেনের গৃহযুদ্ধ, জার্মানির অস্ট্রিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া আক্রমণ প্রভৃতি বিষয়েও জাতিসংঘ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই জাতিসংঘ কার্যতঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্ত ঘটে।

॥ জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ ॥ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হল বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়

ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতা। জাতিসংঘে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্র সদস্য না থাকায় জাতিসংঘের মর্যাদা বিনষ্ট হয়। এছাড়া প্রথম দিকে জার্মানি ও রাশিয়া এর সদস্য না থাকায় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান রূপে জাতিসংঘের কার্যকলাপ ব্যাহত হয়। জাতিসংঘের নিজস্ব কোন সৈন্যদল না থাকায় অপরাধী সদস্য-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় জাতিসংঘ শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। সর্বোপরি বড় বড় রাষ্ট্রগুলি অস্ত্রশস্ত্র কমাতে রাজী না হওয়ায় বিশ্বশান্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে।

———

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার কুড়ি বৎসরের মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। ভার্সাই সন্ধির পর পৃথিবীতে সাময়িক-ভাবে শান্তি আসে। কিন্তু এই সময়ে পরাজিত রাষ্ট্রগুলি তাদের মর্যাদা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করার জন্য শক্তি-সমন্বয়ের কাজে মন দেয়। অপরপক্ষে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে যে সমস্ত রাষ্ট্রের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি তারও তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার জন্য যুদ্ধের পথ বেছে নেয়। ফ্যাসীবাদী ইটালী, নাৎসী জার্মানি ও জাপানের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ভীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। তারা প্রতিবেশী রাজ্যগুলি একে একে গ্রাস করতে আরম্ভ করে। এই ভাবে পৃথিবী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথে এগিয়ে চলে।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণ ॥

॥ পরোক্ষ কারণ: ভার্সাই সন্ধির ত্রুটি ॥ ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ভার্সাই সন্ধির মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল। ভার্সাই সন্ধি জার্মানির উপর চরম আঘাত হানে। তার উপনিবেশ কেড়ে নেওয়া হয়। জার্মানির উপর এক বিরাট ক্ষতিপূরণের বোঝা চাপানো হয়। তার সামরিক শক্তিও বিপুল পরিমাণে নষ্ট করা হয়। জার্মানির প্রতি মিত্রপক্ষের এ অবিচারের ফলেই হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে নাৎসীবাদ কায়েম হয়। হিটলার ভার্সাই সন্ধি বাতিল করে জার্মানির পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প গ্রহণ করেন।

॥ জার্মানি, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সা ॥ জার্মানি, ইটালী ও জাপানের সাম্রাজ্যলিপ্সাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যায়। অপর পক্ষে প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে জাপান ও

ইটালীর ভাগে যে অংশটুকু পড়েছিল তাতে তারা সন্তুষ্ট হয় না। কাজেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে জার্মানি, ইটালী ও জাপান নতুন উদ্যমে উপনিবেশ বিস্তারে সক্রিয় হয়। জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে এবং চীন আক্রমণ করে। ইটালী আবিসিনিয়া দখল করে। হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিও চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে ও পোল্যাণ্ডের দিকে হাত বাড়ায়। এই ভাবে কয়েকটি অপরিতৃপ্ত রাষ্ট্রের আগ্রাসী নীতি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ প্রশস্ত করে।

॥ **পরস্পর-বিরোধী রাষ্ট্রজোট** ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি দুটি পরস্পর-বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়। ইটালী, জার্মানি ও জাপানের মধ্যে 'রোম-বার্লিন-টোকিও অক্ষশক্তি' গঠিত হয়। এই জোট গঠিত হওয়ায় ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স আতঙ্কিত হয়। এতদিন পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্স জার্মানি ও ইটালীকে তোষামোদ করে চলছিল। এইবার তারা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে মিতালী করতে বাধ্য হয়।

॥ **জাতিসংঘের ব্যর্থতা** ॥ বিশ্বশান্তি রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতাও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম কারণ। বিশ্বে যুদ্ধবিগ্রহ রোধ করাই ছিল জাতিসংঘের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু জাপানী, ইটালী ও জার্মানির আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়। ফলে এই সমস্ত রাষ্ট্রের যুদ্ধবাদী মনোভাব বাড়তে থাকে। বিশ্বশান্তি বিপন্ন হয়ে পড়ে। পৃথিবীর পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে।

॥ **প্রত্যক্ষ কারণ** ॥ ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর জার্মানি পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া নিউজীল্যাণ্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের পক্ষে যোগদান করে। রাশিয়া ও ইটালী নিরপেক্ষ থাকে। এক বৎসর পর ইটালী

জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। জাপান আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ যুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী ॥ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় ছ বৎসর ধরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলে। যুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানি জয়লাভ করতে থাকে। ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড জার্মানির আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়। জার্মানি রাশিয়া আক্রমণ করলে ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে মিত্রতা হয়। প্রথমদিকে রাশিরার বিরুদ্ধে জয়লাভ করলেও শেষ পর্যন্ত জার্মানিকে পিছু হটতে হয়। এদিকে পূর্ব রাশিয়ার যুদ্ধে জাপান বিরাট সাফল্যলাভ করে। আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। আমেরিকার আণবিক বোমা হিরোসিমা ও নাগাসাকি ধ্বংস করলে জাপানও আত্মসর্পণ করতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল ॥

॥ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপের বহু প্রধান শহর ধ্বংস হয়। বিশ্বের বিরাট অংশ জুড়ে খাদ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রচণ্ড অভাব দেখা দেয়। মুদ্রাস্ফীতি, মজুত-দারী, কালোবাজারীতে কম বেশী সব দেশ ছেয়ে যায়। বেকার সমস্যাও তীব্র আকার ধারণ করে।

॥ রাজনৈতিক ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিরাট রাজনৈতিক পরিবর্তন ঘটে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলি দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হয়। অপরপক্ষে, সোভিয়েট রাশিয়া ও আমেরিকা প্রথম শ্রেণীর শক্তি হয়ে ওঠে। জার্মানির রাজনৈতিক পরিবর্তন সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। জার্মানিকে পূর্ব ও পশ্চিম—এই দুইভাগে ভাগ করা হয়। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানিতে যথাক্রমে রাশিয়া, এবং ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার প্রভাব

প্রতিষ্ঠিত হয়। নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্য সাম্যবাদী আন্দোলনকে শক্তিশালী ও জনপ্রিয় করে তোলে। এছাড়া যুদ্ধ-শেষে দুর্দশা-পীড়িত জনসাধারণ স্বাভাবিক কারণেই সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে সাম্যবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ **সাম্রাজ্যবাদের অবসান** ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এশিয়া ও আফ্রিকায় উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যের অবসান সূচনা করে। এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসস্তূপের উপর নতুন নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। চীনে সাম্যবাদী বিপ্লব সফল হয় এবং সাম্যবাদী রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্রহ্মদেশ, সিংহল, ভারত ও পাকিস্তান, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, ঘানা, কঙ্গো কেনিয়া প্রভৃতি এশিয়া ও আফ্রিকার পরাধীন দেশ-গুলি মুক্তিলাভের দিন গোনে।

॥ **ঠাণ্ডা লড়াই** ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ইউ. এন. ও. বা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ নামে একটি শান্তি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কিন্তু বড় বড় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে। বিশ্বের রাজনৈতিক আবহাওয়া শান্ত হয় না। অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধ না ঘটলেও পরস্পরের "ঠাণ্ডা লড়াই" বা রাজনৈতিক বিরোধ শুরু হয়।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯১৯-১৯৪৭)

আগেই বলা হয়েছে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জটিল পরিস্থিতির সূত্রপাত হয়। যুদ্ধের শেষে ভারতবাসীর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। ফলে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভের দানা বাঁধে। এই বিক্ষোভ দমনের জন্য কুখ্যাত রাওলাট আইন পাস করা হয়। রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে সারা দেশ জুড়ে হরতাল ও ধর্মঘট পালিত হয়। সরকারী দমননীতিও চরম পর্যায়ে ওঠে। অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে ইংরেজ সেনাপতি মাইকেল ডায়ারের নেতৃত্বে নির্মমভাবে গুলি চালানোর ফলে প্রায় এক হাজার নরনারী নিহত হয়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ইংরেজ সরকারের দেওয়া 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে বিশ্বযুদ্ধের শেষে তুরস্কের শাসনকর্তা খলিফাকে পদচ্যুত করায় এবং তাঁর সাম্রাজ্য ভাগ করায় ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ-বিরোধী খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করে। এছাড়া বিশ্বযুদ্ধের পর খাদ্যাভাব ও জিনিসপত্রের দাম আকাশ-ছোঁয়া হওয়ায় জন-জীবনে চরম দুর্দশা নেমে আসে।

॥ অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০-১৯২২ খ্রীঃ) ॥ দেশের এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের নতুন যুগের সূচনা হয়। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস পুরানো আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি ত্যাগ করে সক্রিয় আন্দোলনের পথে অগ্রসর হন। সরকারী দমন নীতির প্রতিবাদে, খিলাফৎ আন্দোলনের সমর্থনে এবং দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার দাবিতে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অসহযোগ আন্দোলনের দুটি

দিক ছিল—গঠন এবং বর্জন। গঠনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল তাঁত ও চরকাকে জনপ্রিয় করা, অস্পৃশ্যতা ও মাদকদ্রব্য বর্জন এবং হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন। অপরপক্ষে সরকারী বিদ্যালয়, আদালত, আইনসভা, বিদেশী পণ্য ও সরকারী কেতাব বর্জন প্রভৃতি বিষয়গুলি বর্জনমূলক কর্মসূচীর মধ্যে ছিল। গান্ধীজী নিজে তাঁর সরকারী খেতাব 'কাইজার-ই-হিন্দ' বর্জন করে অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। এই আন্দোলনের মূলনীতি ছিল 'অহিংসা' ও 'সত্য'।

অসহযোগ আন্দোলনের আহ্বানে সারা দেশে এক বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, মতিলাল নেহরু, জওহরলাল নেহরু প্রমুখ বিশিষ্ট আইনজীবী নেতৃবৃন্দ আদালত বর্জন করেন। শিক্ষক ও ছাত্রেরা সরকারী বিদ্যালয় বর্জন করেন। দেশের বিভিন্ন জায়গায় জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। চরকা ও তাঁতের ব্যাপক প্রসার ঘটে। অসহযোগ অন্দোলন চরম আকার ধারণ করে। দেশের মানুষের মনে রাজভক্তি জন্মানোর জন্য 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস' ভারত সফরে আসেন। কিন্তু যুবরাজ বোম্বাই আসার পর সারা বোম্বাই-এ হরতাল করা হয়।

মহাত্মা গান্ধী

ইতিমধ্যে আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য সরকারী দমননীতি চরম আকার ধারণ করে। জনসভা ও মিছিল নিষিদ্ধ করা হয়। গান্ধীজী ছাড়া প্রায় সকল নেতাই গ্রেপ্তার হন। কমপক্ষে তিরিশ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার ও কারারুদ্ধ করা হয়। এই অবস্থায় গান্ধীজী ভাইসরয়কে এক চরমপত্র পাঠান। এতে বলা হয় যে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দিলে এবং সরকারী দমননীতি বন্ধ না হলে আইন অমান্য ও কর বর্জন আন্দোলন শুরু করা হবে কিন্তু গুজরাটের বারদৌলীতে এই আন্দোলন শুরু হওয়ার আগেই গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে উত্তেজিত জনতা থানায় আগুন লাগায়। এই ঘটনায়

২১ জন পুলিস নিহত হয়। গান্ধীজী এই সহিংস ঘটনায় বিচলিত হন এবং অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। গান্ধীজীর এই সিদ্ধান্তে সারা দেশ জুড়ে ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাঁর ৬ বছর কারাদণ্ড হয়। গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত প্রথম গণ-আন্দোলন এইভাবে ব্যর্থ হয়। এই আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এর মাধ্যমে ভারতবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি পায়।

॥ **কৃষক আন্দোলন** ॥ ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগ থেকেই ব্রিটিশ সরকার এবং তাদের দোসর জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে এদেশে ছোট বড় নানা ধরনের কৃষক বিদ্রোহ চলতে থাকে। আন্দোলন প্রসার হওয়ায় সাথে সাথে কৃষক আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে শুরু করে। জাতীয় নেতাগণও কৃষকদের স্বার্থরক্ষায় আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবং খাজনা মকুবের দাবিতে বিহারের চম্পারন এবং গুজরাটের খয়রা জেলায় কৃষক আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন মহাত্মা গান্ধী। অসহযোগ আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের মেদিনীপুরে, উত্তর প্রদেশের রায়বেরিলী ও ফৈজাবাদে কর বর্জন এবং বেআইনী করের প্রতিবাদে কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। পাঞ্জাবের শিখ কৃষকরা এবং মালাবারের মোপলা সম্প্রদায় কৃষক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। সর্দার বল্লভ-ভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে বারদৌলীর কৃষকরা কর বর্জন আন্দোলনে যোগ দেয়। গান্ধীজী পরিচালিত আইন অমান্য আন্দোলনের যুগেও সারা দেশব্যাপী কর বর্জন আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দলের প্রচেষ্টায় কৃষক আন্দোলন জোরদার হয়। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ফৈজপুরে নিখিল ভারত কিষাণ সভা স্থাপিত হয়। কিষাণ সভার উদ্যোগে সরকারী দমননীতি, মজুতদারী, কালোবাজারী, জমিদারী প্রথা প্রভৃতির বিরুদ্ধে এবং জাতীয় নেতাদের মুক্তি ও জাতীয় সরকার গঠনের দাবিতে কৃষক আন্দোলন চলতে থাকে।

॥ **শ্রমিক আন্দোলন** ॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে ভারতের শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়। রুশ বিপ্লবের আদর্শ ও চিন্তাধারা শ্রমিক আন্দোলনে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আমেদাবাদের কাপড়ের কলের শ্রমিকদের নিয়ে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। কিন্তু বি. পি. ওয়াদিয়ার নেতৃত্বে গঠিত 'মাদ্রাজ শ্রমিক সংগঠন' প্রকৃতপক্ষে ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করে। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় আসামের চা-শ্রমিক, আসাম রেলওয়ে ও স্টীমার কর্মচারী এবং কয়লা খনি অঞ্চলে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। ইতিমধ্যে লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস' স্থাপিত হয়। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন গঠনে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত "সারা ভারত শ্রমিক-কৃষক"-এর প্রচেষ্টায় অনেকগুলি বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে। ইতিমধ্যে সরকারী দমননীতি চলতে থাকায় নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস ও বিভিন্ন বামপন্থী ইউনিয়নগুলি একসাথে মিলিত হয়।

॥ **আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০-১৯৩৪ খ্রীঃ)** ॥ অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ থাকায় সর্বভারতীয় আন্দোলনে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব দেখা দেয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের শাসন সংস্কার বিবেচনা করার জন্য স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় জাতীয় নেতাগণ এই কমিশন বর্জন করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুনরায় জাতীয় আন্দোলনের পথ প্রস্তুত হয়। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ-স্বরাজের দাবি গৃহীত হয়। পূর্ণ-স্বরাজের দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজীর নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৩০

খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী 'পূর্ণ-স্বরাজ' বা 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হয়।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ গান্ধীজী তাঁর ৭৯ জন সত্যাগ্রহীকে নিয়ে বিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযান শুরু করেন। ৫ই এপ্রিল গান্ধীজী ডাণ্ডিতে লবণ আইন অমান্য করার সাথে সাথে সারা দেশ জুড়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। দেশের সর্বত্র বিদেশী দ্রব্য বর্জন, করদান বন্ধ করা, ধর্মঘট, পিকেটিং, স্কুল-কলেজ বর্জন প্রভৃতি শুরু হয়। হাজার হাজার মহিলা এই প্রথম গণ-আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'সীমন্ত গান্ধী' নামে পরিচিত খান আব্দুল গফ্‌র খানের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন চলতে থাকে। আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ব্রিটিশ সরকার কঠোর দমননীতি প্রয়োগ করেন। ইতিমধ্যে গান্ধীজী ও ভাইসরয় লর্ড আরউইনের মধ্যে 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' হওয়ায় আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা হয়। ব্রিটিশ সরকার দমননীতি বাতিল করতে ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিতে সম্মত হন। ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য গান্ধীজী লণ্ডনের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করেন কিন্তু এই বৈঠকে গান্ধীজীর দাবি মানা হয় না। পরের গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেস যোগ দেয় না।

এদিকে গান্ধী-আরউইন চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও সরকারী দমননীতি চলতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। সরকারী দমননীতিও চরম আকার ধারণ করে। পাইকারী হারে লাঠিচার্জ, গুলিবর্ষণ, জরিমানা ও গ্রেপ্তার চলতে থাকে। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক 'বাঁটোয়ারা' ঘোষণা করে মুসলমান, শিখ ও তফসিলী হিন্দু-সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেন। এর প্রতিবাদে গান্ধীজী অনশন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত ডঃ আমেদকারের

প্রচেষ্টায় 'পুণা চুক্তি' অনুসারে অনুন্নত শ্রেণীর আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হলে গান্ধীজী অনশন ত্যাগ করেন। গান্ধীজীকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হয়। গান্ধীজী দেশবাসীকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দেন। জাতীয় কংগ্রেসও এই আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেয়। আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে একটানা আন্দোলন জাতীয় ঐক্যবোধ, আত্ম-বিশ্বাস ও সংকল্পকে সুদৃঢ় করে। রাজনীতি-সচেতন ভারতবাসী দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে পরবর্তী মুক্তি-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়।

॥ ভারত-ছাড় আন্দোলন (১৯৪২ খ্রীঃ)॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ব্রিটিশের সামরিক ঘাঁটি সিঙ্গাপুর ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করায় ভারতবর্ষের নিরাপত্তা বিপন্ন হয়। এই পরিস্থিতিতে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতে আসেন। তিনি ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু কংগ্রেস ও অন্যান্য রাজনৈতিক দল এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন না। ক্রীপস্ মিশনের ব্যর্থতার ফলে ভারতব্যাপী ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হর। অপরপক্ষে ভারত সীমান্তে জাপানী বাহিনী দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসে। ভারতবাসীর মনে গভীর আশংকার সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে গান্ধীজী তাঁর 'হরিজন' পত্রিকায় ইংরেজের ভারত ত্যাগ করার দাবি জানান।

গান্ধীজীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে বিখ্যাত 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৮ই আগস্ট নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেস কমিটির সভায় এই প্রস্তাব বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অনুমোদন লাভ করে। গান্ধীজীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' ('করব না হয় মরব') বাণী ভারতবাসীর মনে সাড়া জাগায়। ৯ই আগস্ট গান্ধীজী, আজাদ প্রমুখ কংগ্রেস

নেতৃবর্গ গ্রেপ্তার হন। কংগ্রেসী নেতাদের গ্রেপ্তারের সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়' বা '৪২-এর আন্দোলন' শুরু হয়। ভারতবাসী ব্রিটিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ভারতের সর্বত্র উন্মত্ত জনতা রেলপথ, পোস্ট অফিস, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি সরকারী সম্পত্তি আক্রমণ ও তছনচ্ করে। সরকারী অফিস-আদালতে আগুন লাগানো হয়। বাংলাদেশের মেদিনীপুর, উত্তর প্রদেশের বালিয়া, মহারাষ্ট্রের সাতারা প্রভৃতি জেলায় বিপ্লবীরা ব্রিটিশ প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করে অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠন করেন। মেদিনীপুর জেলার ৭৩ বৎসরের বৃদ্ধা মাতঙ্গিনী হাজরা ও আসামের ১০ বৎসরের বালিকা কনকলতা বীরের মৃত্যুবরণ করেন। এই আন্দোলনে ভারতের যুব, ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষকগণও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নির্বিচারে পুলিস ও মিলিটারী বাহিনীর গুলিবর্ষণ ও অত্যাচারের ফলে তিন মাসের মধ্যে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

ভারত-ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হয়। কিন্তু সারা ভারতব্যাপী এই আন্দোলনের প্রসার স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদের জন্য দেশবাসী সংকল্পবদ্ধ। অপরপক্ষে বিদেশী শাসকরাও বুঝতে পারেন ভারতে তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারত-ছাড় আন্দোলন ভারতের মুক্তি-সংগ্রামকে চরম পর্যায়ে নিয়ে যায়।

॥ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ॥ ভারত-ছাড় আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের মুক্তি-সংগ্রাম শেষ হয়। এরপর বিদেশের মাটিতে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রস্তুতি চলে। দেশে যখন আগস্ট আন্দোলন শুরু হয় সে সময় ভারতের বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্র বসু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সহযোগিতায় সশস্ত্র সংগ্রামের পথে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের পরিকল্পনা করেন।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র পুলিসের নজর এড়িয়ে দেশত্যাগ করেন এবং কাবুল হয়ে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে চলে আসেন। এরপর তিনি বার্লিন থেকে জাপানের রাজধানী টোকিও এসে পোঁছান। টোকিও বেতার মারফৎ সুভাষ-চন্দ্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের কথা ঘোষণা করেন। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় যুদ্ধবন্দীদের নিয়ে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' গঠিত হয়। প্রখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারীর আহ্বানে সুভাষচন্দ্র টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে উপস্থিত হন। সুভাষচন্দ্রকে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। তাঁকে আজাদ হিন্দ্ বাহিনী'র সর্বাধিনায়ক করা হয়। নেতাজী সিঙ্গাপুরে স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন।

সুভাষচন্দ্র বসু

জাপানী সামরিক কর্তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর নেতাজী ভারত অভিযান শুরু করেন। আজাদ হিন্দ্ বাহিনী ভারতের পূর্ব-সীমান্তে অবস্থিত কোহিমা, মোরাই প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে এবং ইম্ফল আক্রমণ করে। সম্মিলিত বাহিনী ভারত ব্রহ্মদেশ সীমা অতিক্রম করার পর ভারতের মাটিতে তিনরঙা জাতীয় পতাকা তোলা হয়। ইতিমধ্যে জাপানের সামরিক বিপর্যয় শুরু হয়। ফলে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে প্রয়োজন মত রসদ ও অস্ত্রশস্ত্রের অভাব দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ্ ফৌজ ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মাটিতে ভারতীয়দের সশস্ত্র মুক্তি-সংগ্রামের অবসান ঘটে। এরপর মাঞ্চুরিয়া যাওয়ার পথে এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে নেতাজী ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজের অবদান চিরস্মরণীয়। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সংগঠন, দেশপ্রেম ও বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম ব্রিটিশ

সরকারকে আতংকিত করে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পতন ঘনিয়ে আসে। ভারতীয় সেনাদের নিয়ে দেশ শাসনের দিন শেষ হয়।

॥ আজাদ হিন্দ্ আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া ॥ আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর সংগ্রাম ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ্ সেনাপতিদের বিচারের বিরুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে ধিক্কার জানায়। ইতিমধ্যে বোম্বাই-এ নৌ-বিদ্রোহ শুরু হয়। ক্রমে কলকাতা, করাচী ও মাদ্রাজের নৌকর্মিগণ বিদ্রোহীদের সমর্থনে ধর্মঘট করে। বিদ্রোহীদের সমর্থনে বোম্বাইয়ের জনসাধারণ কয়েকটি অঞ্চলে সরকারী সম্পত্তিতে আগুন লাগায়। অনেক জায়গায় রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করা হয়। উত্তেজিত জনতা, শ্রমিক ও নৌবাহিনীর লোকজনদের সঙ্গে পুলিস ও মিলিটারী বাহিনীর রক্তাক্ত লড়াই চলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রচেষ্টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে। নৌ-বিদ্রোহের ফলে ব্রিটিশ সরকার আর একবার বুঝতে পারেন যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে ভারত শাসন করা আর মোটেই সম্ভব নয়।

॥ ক্ষমতা হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ ॥ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ এট্‌লী ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দানের প্রস্তুতি শুরু করেন। এবিষয়ে ভারতীয় নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্যকে নিয়ে গঠিত 'ক্যাবিনেট মিশন' ভারতে আসে। ক্যাবিনেট মিশনের সুপারিশ অনুসারে সংবিধান সভার নির্বাচন হয় এবং জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। ইতিমধ্যে মিঃ এট্‌লী ঘোষণা করেন যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যেই ভারতের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বিখ্যাত 'মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা' ঘোষণা করেন।

এই পরিকল্পনায় ভারতের সংবিধান রচনা, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির জন্য পৃথক রাষ্ট্র ও পৃথক সংবিধান পরিষদ গঠন, সীমানা কমিশনের দ্বারা বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করা প্রভৃতি বিষয় বলা হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আইন পাস করা হয়। এই আইনের বলে ভারত ও পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। দিল্লীর লালকেল্লায় ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাক নামিয়ে স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়।

জওহরলাল নেহেরু

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীন ভারতের সংবিধান আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত হয় এবং ভারতবর্ষ একটি প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

॥ চীনা প্রজাতন্ত্রে ভাঙন ॥ আগেই বলা হয়েছে যে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু রাজবংশের পতন ঘটে, এবং চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নতুন প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন স্বেচ্ছায় সভাপতির পদ ত্যাগ করে। তাঁর জায়গায় ইউয়ান্-সিকাই নামে একজন সুদক্ষ সেনাপতি সভাপতি নিযুক্ত হন। সান ইয়াৎ-সেনের আশা ছিল যে, ইউয়ান-সিকাই-এর নেতৃত্বে প্রজাতান্ত্রিক সরকার শক্তিশালী হবে। কিন্তু চীনা প্রজাতন্ত্রকে সুদৃঢ় করার চেয়ে ইউয়ান-সিকাই তাঁর নিজের ক্ষমতা বাড়াতেই বেশী আগ্রহী ছিলেন। ডাঃ সেনের উদ্দেশ্য ছিল চীন থেকে সমস্ত রকমের বিদেশী প্রভাব-প্রতিপত্তি নষ্ট করা। কিন্তু ইউয়ান বিদেশী শক্তিগুলির সহযোগিতায় তাঁর ক্ষমতা বাড়াতে চান। ইউরোপের দেশগুলি থেকে প্রচুর ঋণ নিয়ে তিনি চীনের অর্থসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় তাদের হাতে তুলে দেন। জাপানের কুখ্যাত 'একুশ-দফা দাবী' পূরণ করতেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন। এমন কি চীনে পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার তিনি পারকল্পনা করেন। ইউয়ান-এর জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন উদ্বেগ প্রকাশ করেন। দক্ষিণ চীনের সর্বত্র ইউয়ান-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউয়ান-এর মৃত্যু হলে চীন এক বিরাট সংকটের হাত থেকে রক্ষা পায়।

॥ চীনে বিশৃংখলা ও তু-চুনদের স্বেচ্ছাচার ॥ ইউয়ান-সিকাই-এর মৃত্যুর পর চীনে আবার এক নতুন সংকটের সৃষ্টি হয়। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সারা চীন জুড়ে এক চাপা বিশৃংখলা দেখা দেয়। পিকিং-এ কেন্দ্রীয় সরকার নামেমাত্র টিকে থাকে। কিন্তু আসল ক্ষমতা তু-চুন বা একধরনের সামরিক শাসনকর্তাদের দখলে আসে।

এরা চীনে যথেচ্ছাচার চালাতে থাকে। নিজেদের স্বার্থে সরকারী অর্থ কাজে লাগায়। ফলে চীনা জনসাধারণ এক চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটায়। দেশের রাষ্ট্রকাঠামো প্রায় ভেঙে পড়ে। দেশে আবার এক নতুন বিপ্লবী পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

॥ **সান ইয়াৎ-সেন ও কুয়োমিন-তাঙ দল** ॥ দেশের এই দারুণ বিশৃংখলা ও দুরবস্থার সময় ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন ও তাঁর কুয়োমিন-তাঙ দল পুনরায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। কুয়োমিন-তাঙ দলের নেতাগণ দক্ষিণ চীনের ক্যান্টন শহরে একটি সরকার গঠন করেন। ডাঃ সান ইয়াৎ-সেন পুনরায় এই প্রজাতান্ত্রিক সরকারের সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি উত্তর চীনের সামরিক শাসনকর্তাদের সঙ্গে আপস করে চীনকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। ডাঃ সেন ছিলেন আদর্শবাদী নেতা। প্রকৃতপক্ষে তিনিই ছিলেন চীন বিপ্লবের জনক। তাঁর নীতি ছিল জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র। এই তিনটি নীতির ভিত্তিতেই তিনি চীনের সমস্যা সমাধানে ব্রতী হন। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে চীনা জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করা, জনগণকে গণতন্ত্রের শিক্ষা দেওয়া এবং চীনের আবাদী জমি গরীব কৃষকদের মধ্যে সমানভাবে বিলি করে দেওয়া—এইগুলিই ছিল তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য।

॥ **৪ঠা মের আন্দোলন** ॥ ইতিমধ্যে চীনে আর এক গোলযোগের সূত্রপাত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ভার্সাই সন্ধিতে চীনের দাবি-দাওয়া পূরণ না হওয়ায় চীনে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা মে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ভার্সাই সন্ধি গ্রহণ না করার দাবিতে বিক্ষোভ শুরু করে। সারা পিকিং জুড়ে বিদেশী-বিরোধী বিক্ষোভ, শ্রমিক ধর্মঘট ও জাপানী পণ্যসামগ্রী বর্জন আন্দোলন চলতে থাকে। এই আন্দোলন ৪ঠা মে'র আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ যোগদান করেন। তাছাড়া চীনের ইতিহাসে

এই প্রথম এখানকার শ্রমিক শ্রেণী রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ-গ্রহণ করে। এই আন্দোলনে পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক লি টা-চাও বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি রুশ বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আন্দোলনের চাপে উত্তর চীনের পিকিং সরকার চীনা প্রতিনিধিদের ভার্সাই সন্ধি স্বাক্ষর না করার নির্দেশ দেন। অপরপক্ষে পিকিং সরকার থেকে জাপান-সমর্থক মন্ত্রীরাও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

॥ **চীন-সোভিয়েত মৈত্রী** ॥ চীনে এই আভ্যন্তরীণ গোলযোগের ফলে সান ইয়াৎ-সেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকার মিত্রপক্ষের কাছ থেকে কোন রকম সাহায্য পায় না। কাজেই তিনি সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রতা করেন। ইতিমধ্যে রাশিয়া চীনের উপর জারের আমলের সমস্ত রকম অধিকার ও দাবি পরিত্যাগ করে। ফলে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে সহজ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। রুশ-প্রতিনিধি মাইকেল বরোডিনের প্রচেষ্টায় চীনের কুয়োমিন-তাঙ দল নতুনভাবে গঠন করা হয়। রুশ সামরিক কর্মচারীদের সাহায্যে চীনে একটি উন্নত সামরিক বাহিনী গড়ে ওঠে। সোভিয়েত সরকারের সাহায্যে চীনের কৃষি ও শিল্প উন্নতি হয় এবং বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভুত্ব থেকে চীনকে রক্ষা করার লড়াই চলতে থাকে। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক কুয়োমিন-তাঙ দলের নেতা হন।

॥ **কুয়োমিন-তাঙ দলের সঙ্গে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্ক (১৯২১-২৪)** ॥ ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলে চীনের বুদ্ধি-জীবীদের মধ্যে সাম্যবাদী আদর্শের প্রসার ঘটে। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন লি লি-সান ও মাও সে-তুঙ। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল চীনের সামরিক শাসনকর্তাদের উচ্ছেদ, বিদেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াই এবং চীনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। কমিউনিস্ট-

গণ কুয়োমিন-তাঙ দলে যোগ দেয়। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির অনুকরণে কুয়োমিন-তাঙ দলকে নতুনভাবে গঠন করায় এই দলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু কুয়োমিন-তাঙ-এর এক অংশ ঘোর কমিউনিস্ট-বিরোধী ছিল। সান ইয়াৎ-সেনের সময় থেকেই এই বিরোধের সৃষ্টি হয়। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে এই বিরোধ বেশীদূর গড়াতে পারে না। তাঁর মৃত্যুর পর কুয়োমিন-তাঙ ও কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়।

॥ **চিয়াং কাই-শেকের কমিউনিস্ট দমননীতি** ॥ কুয়োমিন-তাঙ দলের নেতা চিয়াং কাই-শেকও ছিলেন ঘোরতর কমিউনিস্ট-বিরোধী। উত্তর চীনের বড় বড় শহরগুলি দখল করে চীনের জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠায় তিনি কমিউনিস্ট রাশিয়ার সাহায্য লাভ করেন। কিন্তু চীনে সাম্যবাদী ভাবধারার প্রচার তিনি সমর্থন করেন না। কাজেই চিয়াং কাই-শেকের সঙ্গে কমিউনিস্টদের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয়। তিনি কমিউনিস্টদের কুয়োমিন-তাঙ দল থেকে বহিষ্কার করেন। সোভিয়েত সরকারের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়। তিনি চীনের সর্বত্র কমিউনিস্টদের উপর অত্যাচার শুরু করেন। এমনকি অনেক জায়গায় কমিউনিস্টদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়।

॥ **কমিউনিস্টদের লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা** ॥ চিয়াং কাই-শেকের আক্রমণের ফলে কমিউনিস্টরা কিয়াংসি অঞ্চলে চলে আসে এবং শহরের পরিবর্তে গ্রামে গ্রামে কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলে। মাও সে-তুঙ এবং চু তে প্রভৃতি কমিউনিস্ট নেতাগণ কিয়াংসি ও ফুকিয়েন অঞ্চলে সোভিয়েত পদ্ধতিতে সরকার গঠন করেন। এই অঞ্চলে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করে চাষীদের মধ্যে জমি বিলি করা হয়। এছাড়া জলসেচ ব্যবস্থা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিকদের কাজের ঘণ্টা কমানো আন্দোলন প্রভৃতি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। এর ফলে কমিউনিস্টদের জনপ্রিয়তা দিন দিন বাড়তে থাকে। কমিউনিস্টদের দমন করার জন্য চিয়াং কাই-শেক

এক বিরাট সেনাবাহিনী পাঠান। এই অবস্থায় মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে এই অঞ্চলের সমস্ত কমিউনিস্ট এবং তাদের সমর্থকরা কিয়াংসি থেকে উত্তর-পশ্চিম চীনের ইয়েনান-এর দিকে যাত্রা শুরু করে। এই পথ ছিল ছ হাজার মাইল দীর্ঘ। চীনের ইতিহাসে এই ঘটনা লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা নামে পরিচিত। পথে বহু কমিউ-নিস্টের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত তারা ইয়েনানে এসে পৌঁছায়।

॥ জাপানী আক্রমণ এবং কুয়োমিন-তাঙ-কমিউনিস্ট মৈত্রী ॥

সিয়াং ফু ঘটনা : চীনের কুয়োমিন-তাঙ এবং কমিউনিস্টদের মধ্যে যখন বিরোধ চলছিল সেই সময় জাপান মাঞ্চুরিয়া আক্রমণ করে। এই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট নেতা মাও সে-তুঙ জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চিয়াং কাই-শেক সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব দেন। কিন্তু চিয়াং কাই-শেক জাপানকে বাধা দেওয়ার চেয়ে কমিউনিস্টদের দমন করতে বেশী আগ্রহী ছিলেন। কাজেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে কুয়োমিন-তাঙ সরকারের জাপান-বিরোধী ঐক্য গড়ে ওঠে না। ইতিমধ্যে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'সিয়াং-ফু' নামক স্থানে চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্টদের হাতে বন্দী হন। তাঁকে দুসপ্তাহ ধরে বন্দী রাখা হয়। সিয়াং-ফু ঘটনার ফলে চিয়াং কাই-শেক কমিউনিস্টদের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে নিতে বাধ্য হন। কিছুদিনের মধ্যেই ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান চীন আক্রমণ করে। কুয়োমিন-তাঙ ও কমিউনিস্ট দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধ করতে এগিয়ে যায়।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও চীন ॥ ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আমেরিকার নৌঘাটি পার্ল হারবার আক্রমণ করলে আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এইভাবে চীন-জাপান যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয়। মিত্রপক্ষ চীনকে নানা-ভাবে সাহায্য করে। চীনের কমিউনিস্ট এবং কুয়োমিন-তাঙ দল

দেশরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধের মোকাবিলা করে। যুদ্ধের সময় দেশে কমিউনিস্টদের প্রভাব বাড়তে থাকে।

॥ কমিউনিস্ট ও কুয়োমিন-তাঙ দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ে চীন জাপানী শত্রুতার হাত থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু যুদ্ধের শেষে চীনের কমিউনিস্ট দল ও কুয়োমিন-তাঙ দলের মধ্যে এক দীর্ঘস্থায়ী গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। গৃহযুদ্ধের সময় চিয়াং কাই-শেক আমেরিকার কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র পান। কিন্তু দুর্নীতিগ্রস্ত অত্যাচারী কুয়োমিন-তাঙ সরকার জনসমর্থনের অভাবে ক্রমাগত পিছু হঠতে থাকে। অপরদিকে চীনা জনসাধারণ এবং রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট কমিউনিস্টগণ যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়। তারা কুয়োমিন-তাঙ সরকারের রাজধানী নানকিং দখল করে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে চিয়াং কাই-শেক চীন থেকে পালিয়ে গিয়ে ফরমোজা বা তাইওয়ান দ্বীপে আশ্রয় নেন। আমেরিকার আওতায় ফরমোজায় চিয়াং কাই-শেকের জাতীয়তাবাদী কুয়োমিন-তাঙ টিকে থাকে।

॥ চীনা গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥ চীনে কমিউনিস্ট আন্দোলন সফল হয়। সমগ্র চীন তাদের দখলে আসে। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর কমিউনিস্টগণ চীনে গণ-প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন। পিকিং হয় এই নয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানী। মাও সে-তুঙ এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রজাতন্ত্রী সরকার অল্পদিনের মধ্যেই অনেকগুলি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভ করে। নয়াচীন ক্রমশঃ বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

মাও সে-তুঙ

॥ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিপ্লব ॥ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝের দিনগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতেও ইউরোপীয় উপনিবেশের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন চলতে থাকে। দ্বিতীয়
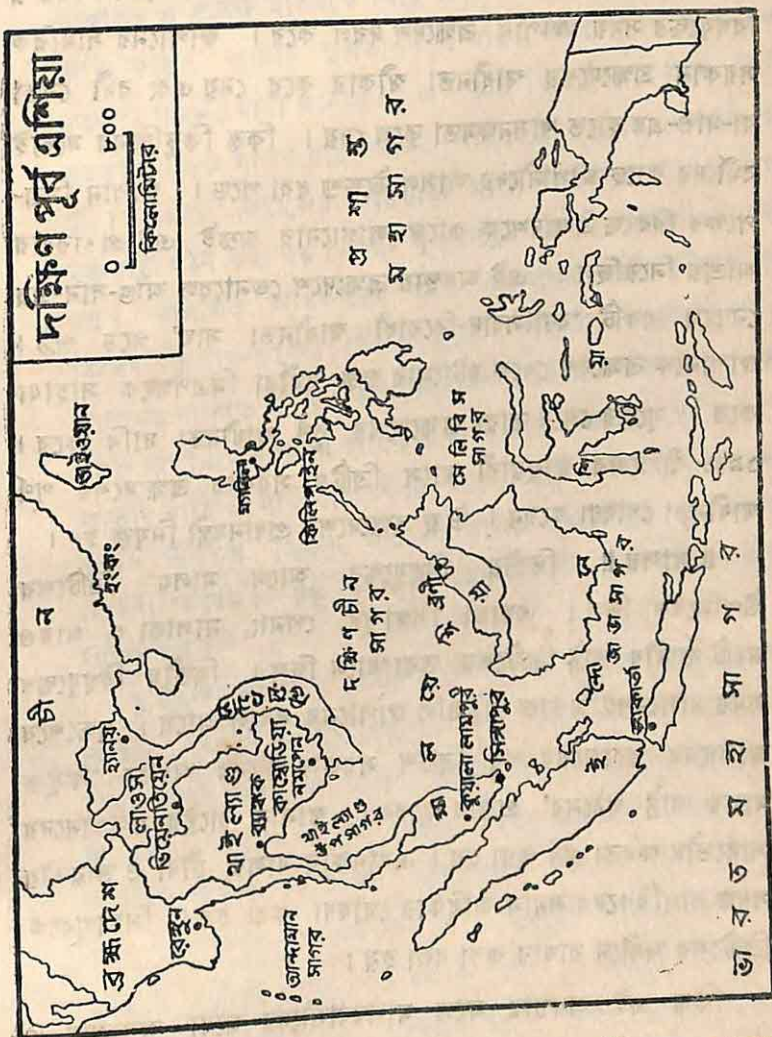
বিশ্বযুদ্ধের শেষে এই আন্দোলন সশস্ত্র আন্দোলন ও বিপ্লবের আকার নেয়। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড প্রভৃতি ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে

ব্রহ্মদেশ, মালয়, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ার জনসাধারণ তীব্র মুক্তি-আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে এই দেশগুলি একে একে স্বাধীনতা লাভ করে।

॥ ব্রহ্মদেশ ॥ ব্রহ্মদেশ ছিল ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ব্রহ্মদেশ দখল করে। জাপানের সামরিক সরকার ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয় এবং বর্মী নেতা বা-মাও-এর হাতে শাসনক্ষমতা তুলে দেয়। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বর্মীদের কাছে জাপানীদের আসল উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। জাপান মিত্র-পক্ষের বিরুদ্ধে ব্রহ্মদেশকে কাজে লাগানোর জন্যই এই প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছিল। এই অবস্থায় ব্রহ্মদেশে জেনারেল আঙ-সান-এর নেতৃত্বে একটি 'ফ্যাসিবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা সংঘ' গড়ে ওঠে। জাপানকে ব্রহ্মদেশ থেকে হটানোর জন্য বর্মীরা মিত্রপক্ষকে সাহায্য করে। যুদ্ধের শেষে তারা ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশ সরকার ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উ নু ব্রহ্মদেশের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

॥ মালয় ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে মালয় ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল। এছাড়া সিঙ্গাপুর, পেনাং, মালাক্কা ও আরও নয়টি স্থানীয় রাষ্ট্র ব্রিটিশের তত্ত্বাবধানে ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মালয়-সহ অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি জাপানের দখলে আসে। যুদ্ধশেষে জাপানের পরাজয়ের পর ব্রিটিশ সরকার তাঁদের অধীনে 'সংযুক্ত মালয় রাষ্ট্র গঠনের' প্রস্তাব করেন। স্থানীয় রাষ্ট্রের সুলতানদের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করা হয়। এখানকার মালয়, চীনা ও ভারতীয় সমস্ত নাগরিকদের সমান অধিকার ঘোষণা করা হয়। সিঙ্গাপুরকে ব্রিটিশের অধীনে রাখার কথা বলা হয়।

কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে মালয়বাসীদের মধ্যে অসন্তোষ ও বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। নিখিল মালয় কংগ্রেসের পরিচালনায় সর্বত্র ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। 'সংযুক্ত মালয় জাতীয় সংস্থা'র

নেতাগণ সমস্ত নাগরিককে সমান অধিকার দান এবং সুলতানদের সার্বভৌম ক্ষমতা খর্ব করার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। অপরদিকে মালয়ের আর একটি জাতীয়তাবাদী দল সিঙ্গাপুর ও সংযুক্ত মালয়কে নিয়ে একটি স্বাধীন মালয় রাষ্ট্র গঠনের দাবি করে। স্থানীয় সুলতানগণও স্বায়ত্ত শাসনের ভিত্তিতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবী জানান। এই তীব্র বিরোধিতার ফলে ব্রিটিশ সরকার সংযুক্ত মালয় রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে বাধ্য হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রিটিশের অধীনে 'মালয় যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা হয়। এই যুক্তরাষ্ট্রের একটি সংবিধানও রচিত হয়। নাগরিক অধিকারের প্রশ্নে মালয়ের অধিবাসীদের কিছু বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র স্থাপনের দাবিতে মালয়ে কমিউনিস্টগণ গণ-বিপ্লব শুরু করে। তারা সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার দাবি করে। তাদের গঠিত 'মালয় জাতীয় বাহিনী' দীর্ঘ পাঁচ বৎসর ধরে লড়াই চালায়। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার মালয় যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। টুঙ্কু আব্দুল রহমান এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন।

॥ ইন্দোনেশিয়া ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে জাভা, সুমাত্রা, বোর্নিও, ক্লিভেন ও নিউ-গিয়ানার অংশ নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজদের উপনিবেশ ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়া জাপানীদের দখলে আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ইন্দোনেশিয়ায় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন প্রসারলাভ করে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মাঝের দিনগুলিতে সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদী আদর্শ ইন্দোনেশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিস্তারলাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে জাপানের পতনের পর ইন্দোনেশিয়ার নেতা সুকর্ণ ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন। কিন্তু হল্যাণ্ডের ওলন্দাজ সরকার এই প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে না। বরং ইন্দোনেশিয়ায় পুনরায়

তাদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য সেনাবাহিনী পাঠানো হয়। কিন্তু ইন্দোনেশীয়দের প্রচণ্ড লড়াইয়ের সামনে ওলন্দাজ বাহিনী বিপর্যস্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে এক চুক্তি অনুসারে ওলন্দাজ সরকার জাভা ও সুমাত্রা নিয়ে গঠিত ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করে নেন। কিন্তু ওলন্দাজ সরকার ও ইন্দোনেশীয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের ফলে এই চুক্তি কার্যকর হয় না।

ইতিমধ্যে ওলন্দাজ সরকার পুনরায় ইন্দোনেশিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজদের প্রচণ্ড আক্রমণে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সেনাবাহিনী পরাজিত হয়। প্রজাতন্ত্রের সভাপতি এবং সহ-সভাপতি সুকর্ণ ও হাট্টা এবং অন্যান্য নেতাগণ বন্দী হন। এর ফলে বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্রে ওলন্দাজদের বিরুদ্ধে এক তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় ওলন্দাজ সরকার ইন্দোনেশিয়ার নেতাদের মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে হেগ শহরে ওলন্দাজ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিগণ এক গোল-টেবিল বৈঠকে মিলিত হন। এই বৈঠকে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে স্বাধীন ও সার্বভৌম ইন্দোনেশীয় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবর্তে 'সংযুক্ত ইন্দোনেশীয় প্রজাতন্ত্র' স্থাপিত হয়। সুকর্ণ এবং ডঃ হাট্টা যথাক্রমে এই প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

॥ **ইন্দোচীন** ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে লাওস, কাম্বোডিয়া, টংকিন, আনাম ও কোচিন-চীন নিয়ে গঠিত ইন্দোচীন ফরাসী উপনিবেশ ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মত ইন্দোচীনেও শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান ইন্দোচীন অধিকার করে। যুদ্ধে পরাজিত জাপান ইন্দোচীন ছেড়ে যাওয়ার সময় লাওস ও কাম্বোডিয়া

বাদে সমগ্র ইন্দোচীনের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আনাম, টংকিন ও কোচিন-চীনকে নিয়ে গঠিত স্বাধীন ভিয়েতনাম রাষ্ট্রের সম্রাট নিযুক্ত হন আনামের প্রাক্তন সম্রাট বাও-ডাই। ইতিমধ্যে আনামের কমিউনিস্টগণ হো চি-মিন-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামের স্বাধীনতার জন্য 'ভিয়েতমিন' নামে একটি সংস্থা গঠন করে। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ভিয়েতমিন দল হো চি-মিনের নেতৃত্বে একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করে। ভিয়েতনামকে একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে ঘোষণা করা হয়। সম্রাট বাও-ডাই পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

জাপানের পতনের পর ফ্রান্স ব্রিটিশ সরকারের সাহায্যে ইন্দোচীনে পুনরায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু নানাকারণে এই প্রচেষ্টা সফল হয় না। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ভিয়েতনাম প্রজাতন্ত্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকার করে। কিন্তু এই ঘোষণা কার্যকরী হওয়ার আগেই উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। ইতিমধ্যে ভিয়েতমিনদের আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য ফ্রান্স প্রাক্তন আনাম সম্রাট বাও-ডাই-এর নেতৃত্বে ভিয়েতনামে একটি পাল্টা সরকার গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিপর্যস্ত ফ্রান্সের পক্ষে ভিয়েত-মিনদের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু কমিউনিস্ট আদর্শ প্রতিরোধ করার জন্য ভিয়েতনামের আসরে ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবেশ ঘটে। আমেরিকার সাহায্য নিয়ে ফ্রান্স ভিয়েতমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতমিনদের প্রচণ্ড আক্রমণে ফরাসী দুর্গ 'দিয়েন বিয়েন ফু'র পতন ঘটে। এই অবস্থায় ফ্রান্স ভিয়েতমিনদের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হয়। ঐ বৎসরই জেনেভা সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ

হো চি-মিন

ভিয়েতনামে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম যথাক্রমে হো চি-মিন ও বাও-ডাই-এর অধীনে থাকে। পর বৎসর কাম্বোডিয়া ও লাওসের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। কিন্তু ভিয়েতমিনদের লড়াই এখানেই শেষ হয় না। পরবর্তীকালে আমেরিকার বিরুদ্ধে ভিয়েতনামের দীর্ঘস্থায়ী লড়াই শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত আমেরিকাকে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে আসতে হয়।

॥ অন্যান্য পরাধীন দেশগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পাশাপাশি এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় আন্দোলন শুরু হয়। মধ্য এশিয়ায় সিরিয়া ও লেবানন ফরাসী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে লড়াই চালায়। মিশর এবং ইরাকে জাতীয় আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। প্যালেস্টাইনের আরব এবং ইহুদীরা ব্রিটিশ প্রভুত্ব উচ্ছেদ করার সংকল্প গ্রহণ করে। উত্তর আফ্রিকায় লিবিয়া, মরক্কো, টিউনিসিয়া ও সুদান উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়। আলজিরিয়ার জনসাধারণ ফরাসী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে মুক্তি-আন্দোলন শুরু করে। আর্জেন্টিনা, ব্রেজিল, মেক্সিকো প্রভৃতি ল্যাটিন আমেরিকা দেশ-গুলিতে সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্বের বিরুদ্ধে জাতীয় আন্দোলন গড়ে ওঠে।

॥ আটলাণ্টিক চার্টার বা অতলান্তিক সনদ ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট আটলাণ্টিক মহাসাগরে একটি যুদ্ধ-জাহাজে বসে 'আটলাণ্টিক চার্টার' নামে একটি সনদ রচনা করেন (আগস্ট ১৯৪১ খ্রীঃ)। এই সনদে বলা হয় যে, নাৎসী জার্মানির ধ্বংসের পর পৃথিবীতে সব জাতি নির্ভয়ে এবং নিরাপদে বাস করতে পারবে। যে সব রাষ্ট্র অক্ষশক্তির আক্রমণে স্বাধীনতা হারিয়েছে তারা

স্বাধীনতা ফিরে পাবে। প্রত্যেক জাতি নিজের ইচ্ছা অনুসারে দেশের সংবিধান রচনা করতে পারবে। বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা ॥ আটলান্টিক সনদের এই ঘোষণা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার সূচনা করে। এই সনদের ভিত্তিতে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ২৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষণাপত্র স্বাক্ষর করেন। পর বৎসর নভেম্বর মাসে রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও চীন 'মস্কো ঘোষণা'র দ্বারা একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কথা প্রচার করে। সবশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো শহরে এক সম্মেলন বসে। এই সম্মেলনে পঞ্চাশটি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (U. N. O.) নামে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই অক্টোবর মাসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে এর উদ্দেশ্য বলা হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, ছোট বড় সব রাষ্ট্রের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, বিশ্বের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা এবং সকল জাতির মানবিক মৌলিক অধিকার রক্ষা করা। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কার্য পরিচালনার জন্য ছ'টি প্রধান সংস্থা গঠিত হয়। এগুলি হ'ল সাধারণ সভা, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি পরিষদ, আন্তর্জাতিক বিচারালয় এবং সদর দপ্তর।

॥ সমাজতান্ত্রিক শক্তির জয়যাত্রা ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে নাৎসী জার্মানির বিরুদ্ধে সোভিয়েত রাশিয়ার সাফল্যে কমিউনিস্ট আন্দোলন শক্তিশালী ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যুদ্ধ-পীড়িত এবং

দুর্দশাগ্রস্ত জনসাধারণ স্বাভাবিক কারণেই সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়। বিশ্বযুদ্ধের পর পশ্চিম ইউরোপের রাজনীতিতে সাম্যবাদী আদর্শের যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। পূর্ব ইউরোপের এক বিরাট অঞ্চলে সাম্যবাদী রাষ্ট্র গঠনে রাশিয়া বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও পূর্ব জার্মানিতে সাম্যবাদী সরকার গঠিত হয়।

॥ **সমাজতান্ত্রিক ও উপনিবেশ-বিরোধী আন্দোলন** ॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলিতেও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন দানা বাঁধে। চিলিতে শ্রমিক অভ্যুত্থান ঘটে, এবং কমিউনিস্টদের সাহায্যে এখানে একটি সরকার স্থাপিত হয়। বলিভিয়া এবং গুয়াতেমালায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু কিউবাতে ফিদেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে সাম্যবাদী বিপ্লব সফল হয়। কিউবার বিপ্লব ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তি-আন্দোলনে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে বিশ্বের এক বিরাট অংশ জুড়ে সমাজতন্ত্রের প্রসার ঘটতে থাকে।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। মধ্যযুগের গ্রামীণ, কৃষিভিত্তিক, সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি কিভাবে রূপান্তরিত হচ্ছিল সংক্ষেপে বুঝিয়ে লেখ।

২। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির রূপান্তরের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব কিভাবে সামন্ততন্ত্রকে আঘাত করেছিল ?

২। দ্বাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃষি বা শিল্পের উৎপাদন প্রণালীতে যে উন্নতি ঘটেছিল তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। রাজা ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সহযোগিতা কিভাবে দেখা দেয় বল।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

১। সামন্ত প্রথাভিত্তিক সমাজ পরিবর্তিত হয় আধুনিক যুগের — সমাজে।

২। —শতাব্দীর শেষদিকে 'ম্যানুফ্যাক্টরা'র মাধ্যমে সমবেত হস্তোৎপাদন প্রথা গড়ে ওঠে।

৩। আধুনিক যুগে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী হয়ে ওঠে —।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও :

১। সামন্ততন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ কৃষকরা/সামন্ত প্রভুরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করে করে দুর্বল হয়ে পড়ে।

২। চতুর্দশ/পঞ্চদশ শতাব্দীতে বারুদের আবিষ্কার সামন্ততন্ত্রের মূলে চরম আঘাত।

৩। 'রেনেশাঁস' হল একটি ভাবজগতের/রাজনৈতিক আন্দোলন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। সংক্ষেপে নবজাগরণের স্বরূপ বিশ্লেষণ কর।

২। মানবতাবাদ বলতে কি বোঝায় ? কয়েকজন মানবতাবাদী ইটালীয় কবি ও সাহিতিকের নাম লেখ। তাঁদের সম্বন্ধে কি জান ?

৩। কয়েকজন মানবতাবাদী ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। নবজাগরণের যুগে চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্যে ইটালীয় শিল্পীদের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৫। বিজ্ঞান চর্চায় রোজার বেকন, স্যার ফ্রান্সিস বেকনের অবদান কি ছিল?

৬। বিজ্ঞানী হিসাবে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চি, কোপার্নিকাস ও গ্যালিলিওর কৃতিত্ব আলোচনা কর ঃ

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। 'রেনেশাঁস' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ কি? শব্দটির সঙ্কীর্ণ অর্থ ও ব্যাপক অর্থ ব্যাখ্যা কর।

২। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের ফলে নবজাগরণ কিভাবে ত্বরান্বিত হয়েছিল বুঝিয়ে বল।

৩। নব-জাগরণ আন্দোলন কেন সর্বপ্রথম ইটালীতে আরম্ভ হয়?

৪। মানবতাবাদী কাদের বলা হয় এবং কেন?

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ (যেকোন দুটি)
পেত্রার্ক, মেকিয়াভেলি, বোকাচ্চিও, উইলিয়ম শেক্সপীয়ার, ইরাসমাস, সারভান্তিস ও রাবেলে।

৬। চিত্রশিল্পী এবং বিজ্ঞানী হিসেবে লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৭। জ্যোতির্বিদ হিসেবে গ্যালিলিওর মূল্যায়ন কর।

৮। মুদ্রণ-কৌশল উদ্ভাবন কে করেন? এর উদ্ভাবনের গুরুত্ব কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

১। 'রেনেশাঁস' শব্দটির আক্ষরিক অর্থ —।

২। মধ্যযুগে ছিল একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি যা ছিল —।

৩। খ্রীষ্টীয় — শতাব্দীতে ইটালীয় ভাষায় সাহিত্য রচনায় সর্বপ্রথম এগিয়ে এসেছিলেন কবি —।

৫। —সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার বলে গণ্য হতে পারেন।

৬। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির — ছবিটি সবচেয়ে প্রাণবন্ত।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ

১। নব-জাগরণ প্রথম দেখা দেয় ইটালীর শহর ফ্লোরেন্সে/সিসিলিতে।

২। পশ্চিম ইউরোপের পণ্ডিতদের ইটালীয়/ল্যাটিন/গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য চর্চা থেকেই নবজাগরণের সূত্রপাত হয়েছিল।

৩। 'ক্যাণ্টারবেরী টেলস্' রচনা করেছিলেন স্পেন্সার/চসার।

৪। ব্রামাণ্টে/গুটেনবার্গ সেণ্ট পিটার গির্জার নকশা এঁকেছিলেন !

৫। দূরবীণ যন্ত্র নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন গ্যালিলিও/কোপার্নিকাস।

তৃতীয় অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারে পর্তুগালের ভূমিকা আলোচনা কর।

২। ভৌগোলিক আবিষ্কারে স্পেনের ভূমিকা সম্বন্ধে কি জান ?

৩। ভৌগোলিক আবিষ্কারের ফলাফল কি হয়েছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কারণ কি ?

২। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ

(ক) প্রিন্স হেনরী, (খ) বার্থোলোমিউ দিয়াজ, (গ) ভাস্কো-ডা-গামা।

৩। নিম্নলিখিত নৌ-অভিযাত্রীদের সম্বন্ধে কি জান ?

(ক) কলম্বাস, (খ) আমেরিগো ভেস্পুচি (গ) ম্যাগেলান।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ভৌগোলিক আবিষ্কারের মূলে ছিল অদম্য কৌতূহল, — ও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের প্রেরণা।

(খ) সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত সামুদ্রিক অভিযানে — এগিয়ে ছিল।

(গ) কলম্বাস পশ্চিম দিকে গিয়ে প্রাচ্যদেশে পেঁছুনো যায় কিনা তা জানার জন্য — পাড়ি দিয়েছিলেন।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে সবচেয়ে বড় অভিযান শুরু করেছিলেন নাবিক —।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ

(ক) 'এ্যাসট্রোলেব' দিক নির্ণয়/অক্ষাংশ নির্ণয় যন্ত্র।

(খ) বার্থোলোমিউ দিয়াজের পথ ধরে ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে পেঁছান কোব্রাল/ভাস্কো-ডা-গামা।

(গ) কলম্বাস আমেরিকার/ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ আবিষ্কার করেন।

(ঘ) নৌ-অভিযাত্রীদলের নায়ক কর্টেজ/পিজারো ইনকা সাম্রাজ্য জয় করেন।

চতুর্থ অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকা বিশ্লেষণ কর।

২। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে মার্টিন লুথারের ভূমিকা ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফলাফল আলোচনা কর।

৩। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্যাথলিক চার্চের ভেতর থেকে যে সংস্কার প্রচেষ্টা শুরু হয় তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৪। ষোড়াশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যে যে ধর্মীয় গৃহযুদ্ধ হয়েছিল তার সূত্রপাত কিভাবে ঘটেছিল? কিভাবে এর অবসান হয়?

৫। নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান?

৬। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে কেন 'আর্মাডা' প্রেরিত হয়েছিল? এর ফলাফল কি হয়েছিল?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের কারণ কি?

২। জন উইক্লিফ কে ছিলেন? তাঁর মতবাদ সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৩। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনে মার্টিন লুথারের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। 'যিশুর সমাজ' ও 'ইনকুইজিশন' সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৫। সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ (যে কোন একটি) ঃ

(ক) ট্রেন্টের 'কাউন্সিল' (খ) অগসবার্গের সন্ধি (গ) আর্মাডা।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সামন্ততন্ত্রের অন্যতম স্তম্ভ — এর ঐক্য ভেঙে যায়।

(খ) ইংল্যান্ডের জন উইক্লিফ ও বোহেমিয়ার — ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের পটভূমিকা রচনা করে গিয়েছিলেন।

(গ) — নেতৃত্বে জার্মানিতে শুরু হয় ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন।

(ঘ) — খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ফিলিপ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আর্মাডা প্রেরণ করেন।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ

(ক) জন উইক্লিফের অনুগামীদের বলা হয় 'প্রোটেস্ট্যান্ট'/'লোলাড'।

(খ) লুথার ইংরাজীতে / জার্মান ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করেন।

(গ) 'যিশুর সমাজে'র প্রতিষ্ঠাতা ইগনেশিয়াস লায়োলা/মৌন উইলিয়ম।

(ঘ) নেদারল্যান্ডের বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল পঞ্চম চার্লসের, দ্বিতীয় ফিলিপের রাজত্বকালে।

(ঙ) লেডেনবাসীরা দিনের পর দিন অনাহারে-অর্ধাহারে থেকেও ইংরেজদের / স্পেনীয়দের বিরোধিতা করেছিল।

পঞ্চম অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে বিরোধের কারণ কি ছিল?

২। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে রাজা ও পার্লামেণ্টের মধ্যে বিরোধের বিবরণ দাও।

৩। ইংল্যাণ্ডে গৌরবময় বিপ্লব কেন হয়েছিল? এর ফলাফল কি?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম জেমসের সঙ্গে পার্লামেণ্টের সম্পর্ক কিরূপ ছিল?

২। সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার সম্বন্ধে কি জান?

৩। ক্রমওয়েল ও 'কমনওয়েলথ' সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ।

৪। গৌরবময় বিপ্লবের গুরুত্ব আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য বিষয় হল রাজার সঙ্গে — এর বিরোধ।

(খ) প্রথম জেমসের মতই প্রথম চালর্স — বিশ্বাসী ছিলেন।

(গ) চার্লস — বছর পার্লামেণ্ট ছাড়াই রাজত্ব করেন।

(ঘ) অলিভার ক্রমওয়েলের উপাধি ছিল —।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ

(ক) লঙ্ পার্লামেণ্ট পনের / কুড়ি বছর স্থায়ী হয়েছিল।

(খ) ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জনুয়ারী প্রথম চার্লস / দ্বিতীয় চার্লসের শিরশ্ছেদ করা হয়।

(গ) দ্বিতীয় জেমস্ / দ্বিতীয় চার্লস ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসলে স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতিসাধনে হুমায়ুন ও আকবরের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

২। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৩। মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি বিস্তৃতিতে ঔরঙ্গজীবের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৪। মুঘল আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্র অঙ্কন কর।

৫। বৈদেশিক পর্যটকদের ভ্রমণবৃত্তান্ত থেকে মুঘল আমলের যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ঔরঙ্গজীবের পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ।

৭। ভারতবর্ষে কিভাবে ইউরোপীয়রা এসেছিল সংক্ষেপে লেখ।
৮। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার একটি নাতিদীর্ঘ বিবরণ দাও।
৯। শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির অভ্যুদয়ের একটি চিত্র অঙ্কিত কর।
১০। পেশোয়াদের অধীনে কিভাবে মারাঠা সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয় দেখাও।
১১। রণজিৎ সিংহের পূর্ব পর্যন্ত শিখদের অভ্যুত্থানের বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। ভারতবর্ষে বাবর কিভাবে মুঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ?
২। বিজেতা হিসেবে আকবরের মূল্যায়ন কর।
৩। মুঘল আমলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার বিবরণ দাও।
৪। অষ্টাদশ শতাব্দীর আরম্ভ পর্যন্ত ইংরেজদের ভারতবর্ষে আগমন কাহিনী লেখ।
৫। তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল কি ?
৬। তেগ বাহাদুর থেকে রঞ্জিৎ সিংহের পূর্ব পর্যন্ত শিখদের ক্ষমতা-বৃদ্ধির কাহিনী বল।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ
(ক) — যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন।
(খ) দূরদর্শী — রাজপুত জাতির সঙ্গে গভীর মৈত্রী গড়ে তোলেন।
(গ) মুঘল সাম্রাজ্যের পরিধি — আমলেই সবচেয়ে বেশী বিস্তৃত হয়।
(ঘ) — রাজত্বকালে ভারতে আসেন রাল্ফ ফিচ।
(ঙ) অর্জুনমল শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ — সঙ্কলন করেন।
(চ) শিবাজী — উপাধি ধারণ করেন।
(ছ) গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে গড়ে ওঠে — বাহিনী।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ
(ক) খানুয়ার / হলদিঘাটের যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন মেবারের রাণা প্রতাপ সিংহ।
(খ) ঔরঙ্গজীবের সময় এসেছিলেন ইটালীয় পর্যটক মানুচ্চি / বের্নিয়ার।
(গ) সর্বশেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে / ঔরঙ্গজীবকে ইংরেজ সরকার রেঙ্গুনে নির্বাসিত করে।
(ঘ) ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রধান কেন্দ্র ছিল কর্ণাটক / বোম্বাই।

সপ্তম অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন ঃ

১। বাংলায় ইংরেজ শাসনের কিভাবে সূচনা হয় ? ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারে বক্সারের যুদ্ধ ও কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের গুরুত্ব কি ?

২। ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড কর্নওয়ালিসের শাসনকালে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার সম্বন্ধে আলোচনা কর।
৩। লর্ড ওয়েলেসলির আমলে কিভাবে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ঘটে দেখাও।
৪। সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে লর্ড ডালহৌসীর মূল্যায়ন কর।
৫। সিপাহী বিদ্রোহের কারণ বিশ্লেষণ কর।
৬। কোম্পানীর আমলে ব্রিটিশ শাসনের ফলাফল আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। 'পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ আধিপত্যের যে সূচনা হয়েছিল তারই পরিণতি ঘটল বক্সারের যুদ্ধে'—আলোচনা কর।
২। 'অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি' বলতে কি বোঝায়। লর্ড ওয়েলেসলি কিভাবে এটি প্রয়োগ করেন ?
৩। লর্ড হেস্টিংস্ কিভাবে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার ঘটিয়েছিলেন বল।
৪। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।
৫। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণ কি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর :
(ক) — বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন করেন।
(খ) — মাধ্যমে ক্লাইভ এদেশে ইংরেজ শাসনকে দৃঢ় ও বিধিসম্মত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন।
(গ) লর্ড ডালহৌসীর পর ভারতের গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন লর্ড —।
(ঘ) নানা সাহেবের সেনাপতি — ফাঁসি হয়।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও :
(ক) ১৭৫৭/১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
(খ) তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল লর্ড কর্নওয়ালিস/ওয়ারেন হেস্টিংস-এর শাসনকালে।
(গ) 'স্বত্ব বিলোপ নীতি' অনুসরণ করেন লর্ড ওয়েলেসলি/ডালহৌসী।
(ঘ) ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাই/মীরাবাই পুরুষের বেশে যুদ্ধ করেছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

রচনাত্মক প্রশ্ন :

১। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণ বিশ্লেষণ কর।
২। শিল্প-বিপ্লব কাকে বলে ? ইংল্যাণ্ডে যে সমস্ত আবিষ্কারের ফলে এই বিপ্লব ঘটে সেগুলি সংক্ষেপে লেখ।
৩। শিল্প-বিপ্লবের ফলাফল আলোচনা কর।

৪। ফরাসী বিপ্লবের পূর্বে ফরাসী দার্শনিকরা চিন্তা ও মনের ক্ষেত্রে যে আলোড়ন এনেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৫। ফরাসী বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। ফরাসী বিপ্লবের সৈনিক হিসেবে নেপোলিয়নের মূল্যায়ন কর।

৭। নেপোলিয়নের সম্রাটপদ লাভের পর থেকে তাঁর পতন পর্যন্ত ঘটনাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ঔপনিবেশিকরা জয়লাভ করেছিল কেন?

২। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলাফল কি?

৩। অষ্টাদশ শতাব্দীর পর কৃষিতে কিভাবে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়?

৪। টীকা লেখ (যে-কোন দুটি)

(ক) মণ্টেস্কু, (খ) ভলতেয়ার এবং (গ) রুশো।

৫। 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' সম্বন্ধে কি জান?

৬। ফরাসী বিপ্লবের ফলাফল কি?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

[এক] শূন্যস্থান পূর্ণ কর ঃ

(ক) ঔপনিবেশিকরা আমদানি বা রপ্তানি বাণিজ্য — মারফত করতে বাধ্য হত।

(খ) — ইংল্যাণ্ডে প্রথম — বিপ্লব দেখা দিয়েছিল।

(গ) — আবিষ্কার করেন বাষ্পীয় ইঞ্জিন।

(ঘ) রুশোর বিখ্যাত বই —।

(ঙ) নেপোলিয়ন — খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট হন।

[দুই] অশুদ্ধ শব্দটি কেটে দাও ঃ

(ক) ঔপনিবেশিকরা ১৭৭৬/১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

(খ) 'সেফটি ল্যাম্প' আবিষ্কার করেন হামফ্রে ডেভি/ম্যাকাডাম।

(গ) 'স্পিরিট অব্ দি লজ' বইটি ভলতেয়ার/মণ্টেস্কুর রচনা।

(ঘ) নেপোলিয়ন এলবা/ওয়াটার্লুতে পরাজিত হয়ে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসিত হন।

নবম অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। ভিয়েনা সম্মেলনে ইউরোপীয় শক্তিগুলির উদ্দেশ্য ও নীতি সংক্ষেপে লেখ।

২। "মেটারনিক ব্যবস্থা" কাকে বলে? এই ব্যবস্থা প্রয়োগের জন্য কি কি করা হয়েছিল?
৩। ইউরোপীয় শক্তিসংঘের কার্যাবলী সংক্ষেপে লেখ।
৪। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে ম্যাটসিনি ও কাভুরের ভূমিকা আলোচনা কর।
৫। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনে বিসমার্কের ভূমিকা সংক্ষেপে লেখ।
৬। আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কি কি কারণ ছিল?
৭। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিংকন কি ভূমিকা গ্রহণ করেন?
৮। ইউরোপে যন্ত্রসভ্যতার বিকাশ কিভাবে ঘটেছিল?
৯। ইউরোপে যন্ত্রসভ্যতার ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের মতবাদ সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। ভিয়েনা সম্মেলনের নেতাদের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল?
২। অস্ট্রিয়াকে জাতীয়তাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করার জন্য মেটারনিক কি কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?
৩। 'ইউরোপীয় শক্তিসংঘ' বলতে কি বোঝ?
৪। 'ইউরোপীয় শক্তিসংঘের' উদ্দেশ্য কি ছিল? ঐ সংঘের বৈঠক কোথায় বসেছিল?
৫। ইউরোপের কোন্ কোন্ দেশে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়?
৬। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনের কারণ কি?
৭। ইটালীর ঐক্য আন্দোলনে 'কার্বোনারী সমিতি'র ভূমিকা কি ছিল?
৮। গ্যারিবল্ডি কে ছিলেন? ইটালীর ঐক্যসাধনে তিনি কি ভূমিকা নিয়েছিলেন?
৯। জার্মানির ঐক্য আন্দোলনের কারণ কি?
১০। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাশিয়ার যুদ্ধের কারণ কি? এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল?
১১। ক্রীতদাস প্রথা কাকে বলে? আমেরিকার কোন্ অংশ ক্রীতদাস প্রথা বন্ধ করতে রাজী ছিল না?
১২। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে কি কি বিষয়ে বিরোধ ছিল?
১৩। আমেরিকার গৃহযুদ্ধে আব্রাহাম লিংকনের উদ্দেশ্য কি ছিল?
১৪। যন্ত্রসভ্যতা বিকাশের ফলে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে রেষারেষি হওয়ার কারণ কি?
১৫। শ্রমিক-মালিক বিরোধের কারণ কি ছিল?
১৬। শ্রেণী-বিরোধ সম্পর্কে মার্কস কি বলেছেন?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ভিয়েনা সম্মেলনের সভাপতি কে ছিলেন ?
২। 'মেটারনিক ব্যবস্থা' কে চালু করেন ?
৩। 'কার্লসবাড ডিক্রি' কোন্ দেশে প্রয়োগ করা হয় ?
৪। ইউরোপীয় শক্তিসংঘের প্রথম এবং শেষ বৈঠক কোথায় বসে ?
৫। 'প্রেসিডেণ্ট মনরো' কে ছিলেন ?
৬। মেটারনিক কোন্ সময় ভিয়েনা হতে পালিয়ে যান ?
৭। ইটালীর কোন্ অঞ্চলে 'কার্বোনারী সমিতি' গঠিত হয় ?
৮। 'ইটালীর স্বাধীনতার জনক' কাকে বলা হয় ?
৯। কাউণ্ট কাভুর কোন্ সম্মেলনে যোগ দেন ?
১০। কাউণ্ট কাভুর ও তৃতীয় নেপোলিয়নের মধ্যে কোন্ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?
১১। ইটালীতে 'লাল কোর্তা' বাহিনীর নেতা কে ছিলেন ?
১২। ইটালীর ঐক্য আন্দোলন শেষ হওয়ার সময় ইটালীর রাজা কে ছিলেন ?
১৩। কোন্ যুদ্ধে অস্ট্রিয়া প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত হয় ?
১৪। কোন্ যুদ্ধে ফ্রান্স প্রাশিয়ার কাছে পরাজিত হয় ?
১৫। নবগঠিত জার্মান সাম্রাজ্যের সম্রাট কে হন ?
১৬। কোন্ বৎসর আমেরিকার গৃহযুদ্ধ আরম্ভ ও শেষ হয় ?
১৭। আব্রাহাম লিঙ্কনকে কে হত্যা করে ?
১৮। আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথা কে বিলোপ করেন ?
১৯। আধুনিক সমাজতন্ত্রবাদের স্রষ্টা কে ?
২০। 'কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো' কে প্রকাশ করেন ?
২১। কার্ল মার্কসের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কি ?
২২। 'প্রথম আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংঘ' কে প্রতিষ্ঠা করেন ?

দশম অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম আফিং যুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলাফল কি হয়েছিল ?
২। দ্বিতীয় আফিং যুদ্ধের কারণ কি ? এর ফলাফল কি হয়েছিল ?
৩। চীনকে কেন্দ্র করে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ। এর ফলাফল কি হয়েছিল ?
৪। 'উন্মুক্তদ্বার নীতি' বলতে কি বোঝ ? কোন্ পরিস্থিতিতে এই নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল ?
৫। চীনে তাইপিং বিদ্রোহ সম্পর্কে কি জান লেখ।

৬। 'একশত দিনের সংস্কার' বলতে কি বোঝ? এই সংস্কার ব্যর্থ হয় কেন?
৭। 'বক্সার বিদ্রোহ' সম্পর্কে লেখ। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হয় কেন?
৮। রাজমাতা জু সি'র শাসন-সংস্কার সংক্ষেপে লেখ।
৯। মাঞ্চু রাজবংশের কি ভাবে পতন ঘটে?
১০। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের চীন বিপ্লবের কারণ কি? এই বিদ্রোহে সান ইয়াৎ-সেনের ভূমিকা কি ছিল?
১১। 'মেজি যুগ' কোন্‌টিকে বলা হয়? মেজি যুগে জাপান সম্রাটের পুনঃপ্রতিষ্ঠা সম্পর্কে আলোচনা কর।
১২। জাপানের সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
১৩। কি কারণে জাপান সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে?
১৪। চীন-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।
১৫। রুশ-জাপান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। নানকিং-এর সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? এই সন্ধির শর্ত কি কি ছিল?
২। টিয়েনসিনের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? এই সন্ধির শর্তগুলি কি?
৩। 'অতিরাষ্ট্রিক অধিকার' বলতে কি বোঝায়?
৪। চীনের কোন্ কোন্ অংশ বিদেশী রাষ্ট্রগুলি ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেয়?
৫। তাইপিং বিদ্রোহের কারণ কি?
৬। বক্সার বিদ্রোহের কি উদ্দেশ্য ছিল? এই বিদ্রোহকে বক্সার বিদ্রোহ বলা হয় কেন?
৭। সান ইয়াৎ-সেন চীনের রাষ্ট্রপতিপদ ত্যাগ করেন কেন?
৮। সান ইয়াৎ সেন এর পর চীনের রাষ্ট্রপতি কে হন?
৯। প্রথম দিকে জাপানের রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল?
১০। জাপানের সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ কিভাবে স্থাপিত হয়?
১১। ইঙ্গ-জাপান মৈত্রী কিভাবে স্থাপিত হয়? এই মৈত্রীর ফলাফল কি হয়েছিল?
১২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপানের ভূমিকা কি ছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। চীনে কে আফিম-এর ব্যবসা বন্ধ করার চেষ্টা করেন?
২। চীনে 'উন্মুক্তদ্বার' নীতি কে ঘোষণা করেন?

৩। চীনে তাইপিং বিদ্রোহের নেতা কে ছিলেন ?
৪। একশত দিনের সংস্কারের সময় চীনের সম্রাট কে ছিলেন ?
৫। কার পরামর্শে চীনের সংস্কার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় ?
৬। 'আই হো-চুয়ান' বলতে কি বোঝ ?
৭। সান ইয়াৎ-সেন কোন্ দল গঠন করেন ?
৮। চীন প্রজাতান্ত্রিক সরকারের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ?
৯। জাপানীরা তাদের দেশকে কি বলত ?
১০। সর্বপ্রথম জাপানের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্পর্ক স্থাপন কে করেন ?
১১। 'মেজি' যুগে জাপানের সম্রাট কে ছিলেন ?
১২। জাপানের সংস্কার সাধনে দু' জন জাপানী নেতার নাম কর।
১৩। জাপানী সাম্রাজ্যবাদের প্রথম শিকার কে ?
১৪। চীন-জাপান যুদ্ধ কোন্ সন্ধির দ্বারা শেষ হয় ?
১৫। রুশ-জাপান যুদ্ধ কোন্ সন্ধির দ্বারা শেষ হয় ?
১৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান চীনের কাছে কোন্ দাবি পেশ করে ?

একাদশ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসনব্যবস্থায় কি পরিবর্তন হয় ?
২। লর্ড ক্যানিং-এর শাসন-সংস্কার সংক্ষেপে লেখ।
৩। লর্ড রিপনের শাসন-সংস্কার সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। শাসক হিসাবে লর্ড কার্জনের ভূমিকা আলোচনা কর।
৫। দ্বিতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।
৬। তিব্বতের সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক আলোচনা কর।
৭। ব্রহ্মদেশ কিভাবে ব্রিটিশদের অধিকারে আসে ?
৮। উনিশ শতকের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সংক্ষেপে লেখ।
৯। উনিশ শতকের সমাজ-সংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?
১০। ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনার বিকাশ ও প্রসার কিভাবে ঘটেছিল ?
১১। ভারতবর্ষে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে কি জান ?
১২। ভারতবর্ষে চরমপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য লর্ড লিটন কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?
২। শাসনব্যবস্থায় ভারতবাসীকে সুযোগ দেওয়ার জন্য লর্ড রিপন কি ব্যবস্থা নিয়েছিলেন ?
৩। কৃষি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে লর্ড কার্জন কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন ?
৪। ভারতের সীমান্ত রাজ্যগুলির প্রতি ব্রিটিশের নীতি কি ছিল ?

৫। উনিশ শতকের ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার কেন শুরু হয়েছিল ?
৬। জাতীয়-আন্দোলন প্রসারে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কি ভূমিকা ছিল ?
৭। প্রথম দিকে জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ কেমন ছিল ?
৮। বাংলাদেশের বাইরে এদেশে ও বিদেশে চরমপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ?
২। কার সময়ে কাগজের নোট চালু হয় ?
৩। 'দুর্ভিক্ষ কমিশন' কে গঠন করেন ?
৪। কার আমলে 'ইলবার্ট বিল' রচনা করা হয় ?
৫। কৃষকদের জন্য সমবায় সমিতি কে গঠন করেন ?
৬। কার আমলে 'বিশ্ববিদ্যালয় আইন' পাস হয় ?
৭। বাংলাদেশকে ভাগ করার প্রতিবাদে কোন্ আন্দোলন শুরু হয় ?
৮। শের আলি কে ছিলেন ?
৯। গানদামুকের সন্ধি কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় ?
১০। লর্ড কার্জন কাকে তিব্বতে পাঠান ?
১১। ব্রিটিশ সরকার ও তিব্বতের মধ্যে কোন্ সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় ?
১২। ব্রহ্মদেশ অধিকার করার সময় সেখানকার রাজা কে ছিলেন ?
১৩। 'ব্রাহ্মসমাজ' কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
১৪। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ?
১৫। প্রার্থনা-সমাজ কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
১৬। বাংলাদেশে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের নেতা কে ছিলেন ?
১৭। মহারাষ্ট্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন কারা পরিচালনা করেন ?
১৮। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কে আন্দোলন করেন ?
১৯। 'ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের' প্রতিষ্ঠাতা কে ?
২০। কোন্ বৎসর জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় ?
২১। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কোন্ বিদেশীর প্রধান ভূমিকা ছিল ?
২২। জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি কে ?
২৩। কোন্ শহরে জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন বসে ?
২৪। বাংলাদেশের দুজন চরমপন্থী নেতার নাম কর।
২৫। ভারতবর্ষে প্রথম গুপ্ত সমিতি কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
২৬। বাংলাদেশ, বাংলাদেশের বাইরে এবং ভারতের বাইরে বিপ্লবী আন্দোলনের একজন করে নেতার নাম কর।

২৭। বাংলাদেশে ও বাংলাদেশের বাইরে একটি করে বিপ্লবী সমিতির নাম কর।

দ্বাদশ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ কি কি ছিল ?
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ কি ছিল ?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে কি জান ?
৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষের ব্রিটেনকে সাহায্য করার কারণ কি ছিল ?
৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতবর্ষে এবং বিদেশে সশস্ত্র বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা কর।
৭। হোমরুল আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৮। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরীভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কিভাবে পরস্পর-বিরোধী শক্তিজোট গড়ে ওঠে ?
২। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে কি জান ?
৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি কতখানি দায়ী ছিল ?
৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে সমাজ ও রাজনীতিতে কি পরিবর্তন হয় ?
৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণ কি ছিল ?
৬। লক্ষ্ণৌ চুক্তি স্বাক্ষর সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৭। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার সম্পর্কে কি জান ?
৮। বিশ্বযুদ্ধ শেষে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের কারণ কি ?
৯। অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তুতি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। কোন্ বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ?
২। কোন্ বৎসর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ?
৩। সেরাজেভো শহরে কাকে হত্যা করা হয় ?
৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়লাভ করে ?
৫। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানির সম্রাট কে ছিলেন ?
৬। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে কোন্ কোন্ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় ?

৭। জাতীয় কংগ্রেসের কোন্ অধিবেশনে ব্রিটেনকে বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য দানের প্রস্তাব গৃহীত হয় ?
৮। বিশ্বযুদ্ধের সময় ভারতে কোন্ সর্বপ্রধান লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প গড়ে ওঠে ?
৯। বুড়িবালামের লড়াই-এর নেতা কে ছিলেন ?
১০। বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য আর কোন্ নামে পরিচিত ছিলেন ?
১১। বালেশ্বরে কোন্ যুদ্ধজাহাজ আসার কথা ছিল ?
১২। পাঞ্জাব সহ সারা উত্তর ভারতে বিপ্লবীদের সংগঠিত করার দায়িত্ব কে গ্রহণ করেন ?
১৩। লাহোর ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত দু জন বিপ্লবীর নাম কর।
১৪। 'গদর' শব্দের অর্থ কি ?
১৫। 'গদর পার্টি' কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয় ও কে এই পার্টির নামকরণ করেন ?
১৬। 'গদর পার্টির' উদ্দেশ্য কি ছিল ?
১৭। বেলুচিস্থানে স্বাধীন সরকার কারা গঠন করেন ?
১৮। বার্লিনে প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী কমিটির নাম কি ?
১৯। কোন্ বছর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিদ্রোহ ঘোষণা করে ?
২০। হোমরুল আন্দেলন প্রথম কে শুরু করেন ?
২১। 'হোমরুল দিবস' কখন পালন করা হয় ?
২২। 'হোমরুল আন্দোলন' গড়ে তোলার জন্য কোন্ কোন্ পত্রিকা প্রকাশিত হয় ?
২৩। কোন্ বছর লক্ষ্নৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?
২৪। রাওলাট আইন কোন্ বছর পাস করা হয় ?
২৫। কোন্ বছর কোন্ তারিখে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঘটে ?
২৬। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ কি উপাধি বর্জন করেন ?
২৭। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার কোন্ বছর প্রবর্তন করা হয় ?
২৮। তুরস্কের সুলতানকে কি বলা হত ?
২৯। সর্বভারতীয় খিলাফৎ সম্মেলন কোন্ বছর এবং কোথায় অনুষ্ঠিত হয় ?
৩০। কোন্ বছরে গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেন ?
৩১। ঐতিহাসিক অসহযোগ আন্দোলনের রণ-কৌশল কে প্রকাশ করেন ?

ত্রয়োদশ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। রুশ বিপ্লবের কারণগুলি সংক্ষেপে লেখ।
২। বলশেভিক দল কিভাবে রাশিয়ায় ক্ষমতা দখল করে ?

৩। রুশ বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় কি পরিবর্তন ঘটে ?

৪। ইউরোপ ও বিশ্বে রুশ বিপ্লবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। রুশ বিপ্লবের আগে রাশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল ?

২। রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের ভূমিকা কি ছিল ?

৩। রুশ-বিপ্লবে লেনিনের ভূমিকা সম্পর্কে লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। কোন্ বৎসর রুশ বিপ্লব শুরু হয় ?

২। রুশ বিপ্লবের সময় রাশিয়ার জার কে ছিলেন ?

৩। কার পরামর্শমত জার শাসন চালাতেন ?

৪। কোন্ পত্রিকা রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিপ্লবী চেতনা সৃষ্টি করে ?

৫। 'এপ্রিল থিসিস' কে ঘোষণা করেন ?

৬। বলশেভিক দলের নেতা কে ছিলেন ?

৭। লেনিনের ঠিক আগে রাশিয়ার শাসন ক্ষমতায় কে ছিলেন ?

চতুর্দশ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। ভার্সাই সন্ধির কি কি ত্রুটি ছিল ?

৩। জার্মানি বাদে অন্যান্য পরাজিত রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তিগুলি সংক্ষেপে লেখ।

৪। মুসোলিনী কে ছিলেন ? তিনি কিভাবে ইটালীতে ক্ষমতা দখল করেন ?

৫। হিট্‌লার কিভাবে জার্মানিতে ক্ষমতা দখল করেন ?

৬। 'লীগ অব্ নেশনস্' বা 'জাতিসংঘ' কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

৭। জাতিসংঘের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে কি জান ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। প্যারিস শান্তি সম্মেলন কেন আহ্বান করা হয় ? এই সম্মেলনে কারা নেতৃত্ব করেন ?

২। প্যারিস শান্তি সম্মেলনে কোন্ কোন্ শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ?

৩। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ইটালীর অবস্থা কেমন ছিল ?

৪। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে জার্মানির অবস্থা কেমন ছিল ?

৫। জাতিসংঘ ব্যর্থ হয় কেন ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। 'চৌদ্দ-দফা' নীতি কে পেশ করেন ?

২। কোন্ সন্ধিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বীজ নিহিত ছিল ?

৩। মুসোলিনী কোন্ দলের প্রতিষ্ঠা করেন ?

৪। 'দুচে' কার উপাধি ছিল ?

৫। 'মেইন কামফ্' কে রচনা করেন ?

৬। হিট্‌লার কোন্ দলের প্রতিষ্ঠা করেন ?

৭। ক্ষমতালাভের পর হিট্‌লার কি নামে পরিচিত হন ?

৮। কোন্ বৎসর এবং কোথায় জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরোক্ষ কারণ কি কি ?

২। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বের অবস্থা কেমন ছিল ?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রধান ঘটনাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ফলাফল কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য জার্মানি, জাপান ও ইটালীর দায়িত্ব কতখানি ছিল ?

২। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে কি ধরনের রাষ্ট্রজোট গড়ে ওঠে ?

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে এশিয়া ও আফ্রিকায় কি পরিবর্তন হয় ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয় এবং কখন শেষ হয় ?

২। 'অক্ষশক্তি' কোন্ কোন্ দেশের মধ্যে গঠিত হয় ?

৩। কোন্ দেশকে আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ?

৪। জাপানের কোন্ কোন্ শহরে আমেরিকা 'আণবিক বোমা' বর্ষণ করে ?

৫। কোন্ দেশের পরাজয়ের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ?

ষোড়শ অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন :

১। অসহযোগ আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। আইন-অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?

৩। ভারত-ছাড় আন্দোলনের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
৪। সুভাষচন্দ্র বসু ও আজাদ হিন্দ্ বাহিনী সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৫। ব্রিটিশের ক্ষমতা-হস্তান্তর ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন :

১। কোন্ পরিস্থিতিতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় ?
২। অসহযোগ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও কর্মসূচী কি ছিল ?
৩। অসহযোগ আন্দোলন কেন ব্যর্থ হয় ?
৪। ভারতে কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?
৫। ভারতে শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৬। কোন্ পরিস্থিতিতে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ?
৭। কোন্ পরিস্থিতিতে ভারত-ছাড় আন্দোলন শুরু হয় ? এই আন্দোলন ব্যর্থ হয় কেন ?
৮। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে 'ভারত-ছাড়' আন্দোলনের গুরুত্ব কি ?
৯। নেতাজী সুভাষের ভারত অভিযান সংক্ষেপে লেখ।
১০। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর পরাজয়ে দেশে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। ভারতবাসীর বিক্ষোভ দমনের জন্য কোন্ আইন পাস করা হয় ?
২। রবীন্দ্রনাথ কোন্ ঘটনার প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেন ?
৩। ভারতে মুসলমান সম্প্রদায় ব্রিটিশ-বিরোধী কোন্ আন্দোলন শুরু করেন ?
৪। কোন্ বৎসর অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় ?
৫। গান্ধীজী কোন্ সরকারী খেতাব বর্জন করেন ?
৬। কোন্ ঘটনার পর অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ করা হয় ?
৭। নিখিল ভারত কিষাণ-সভা কখন প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৮। কোন্ দলের প্রচেষ্টায় বামপন্থী শ্রমিক সংগঠন গড়ে ওঠে ?
৯। কোন্ ঘটনার পর আইন-অমান্য আন্দোলন শুরু হয় ?
১০। 'সীমান্ত গান্ধী' কাকে বলা হয় ?
১১। গান্ধী-আরউইন চুক্তি কোন্ বৎসর স্বাক্ষরিত হয় ?
১২। 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' কে ঘোষণা করেন ?
১৩। 'পুণা চুক্তি' কার প্রচেষ্টায় স্বাক্ষরিত হয় ?
১৪। কোন্ বৎসর 'ভারত-ছাড়' প্রস্তাব গৃহীত হয় ?
১৫। ভারত-ছাড় আন্দোলনে কোন্ বৃদ্ধা মহিলা মৃত্যুবরণ করেন ?
১৬। কে 'নেতাজী' আখ্যায় ভূষিত হন ?
১৭। 'আজাদ হিন্দ্' বাহিনীর পরাজয়ের পর দেশে কোন্ বিদ্রোহ শুরু হয় ?

১৮। ভারতের স্বাধীনতা আইন কবে পাস করা হয় ?
১৯। ভারতের শেষ ভাইসরয় কে ছিলেন ?
২০। কবে এবং কখন ভারত স্বাধীনতা লাভ করে ?

সপ্তম অধ্যায়

রচনামূলক প্রশ্ন ঃ

১। চীনা প্রজাতন্ত্রে ভাঙনের কারণ কি ?
২। চীনের বিপ্লব আন্দোলনে সান ইয়াৎ-সেনের কি ভূমিকা ছিল ? তাঁর তিনটি নীতি কি কি ?
৩। ৪ঠা মে'র আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।
৪। প্রথম দিকে কুয়োমিন-তাঙ দলের সঙ্গে কমিউনিস্টদের সম্পর্ক কেমন ছিল ?
৫। মাও সে-তুঙ-এর নেতৃত্বে লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৬। কমিউনিস্ট এবং কুয়োমিন-তাঙ দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সংক্ষেপে লেখ। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল ?
৭। মালয়ের স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্ষেপে আলোচনা কর।
৮। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলন সংক্ষেপে লেখ।
৯। ভিয়েতনামের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।
১০। 'আটলাণ্টিক চার্টার' সম্পর্কে কি জান ?
১১। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য কি ছিল ?

সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

১। চীনে তু-চুন-দের স্বেচ্ছাচার সম্পকে লেখ।
২। সান ইয়াৎ-সেনের আমলে চীন-সোভিয়েত মৈত্রী সম্পর্কে কি জান ?
৩। চিয়াং কাইশেক কমিউনিস্টদের প্রতি কি নীতি গ্রহণ করেন ?
৪। জাপানী আক্রমণের সময় কুয়োমিন-তাঙ ও কমিউনিস্টদের মধ্যে কিভাবে মৈত্রী স্থাপিত হয় ?
৫। ব্রহ্মদেশের জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ?
৬। ইন্দোচীনের আন্দোলন বন্ধ করতে ফরাসীরা কি ভূমিকা নিয়েছিল ?
৭। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ?
৮। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পরাধীন দেশগুলির জাতীয় আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা কর।
৯। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে সমাজতান্ত্রিক শক্তির সাফল্য সম্পর্কে কি জান ?
১০। ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলির আন্দোলন সম্পর্কে লেখ।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সান ইয়াৎ-সেনের পর চীনা প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি কে হন ?
২। তুং-চুন কাদের বলা হত ?
৩। ৪ঠা মে'র আন্দোলনে কে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন ?
৪। সান ইয়াৎ-সেনের পর কুয়োমিন-তাঙ দলের নেতা কে ছিলেন ?
৫। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে কে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন ?
৬। কিয়াংসি অঞ্চলে কারা কমিউনিস্ট আন্দোলন গড়ে তোলেন ?
৭। লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা কোথায় শুরু হয় এবং কোথায় শেষ হয় ?
৮। কোন্ ঘটনার ফলে চিয়াং-কাইশেক ও কমিউনিস্টদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয় ?
৯। চীন-জাপান যুদ্ধ কোন্ যুদ্ধের সঙ্গে যুক্ত হয় ?
১০। কখন চীনে গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ?
১১। চীন গণ-প্রজাতন্ত্রের প্রথম সভাপতি কে ছিলেন ?
১২। কোন্ বৎসর ব্রহ্মদেশ স্বাধীনতা লাভ করে ?
১৩। কোন্ বৎসর মালয় পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে ?
১৪। ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কারা নিযুক্ত হন ?
১৫। কার নেতৃত্বে 'ভিয়েতমিন' দল গঠিত হয় ?
১৬। কার নেতৃত্বে ফ্রান্স ভিয়েতনামে পাল্টা সরকার গঠন করে ?
১৭। কোন্ সম্মেলনে উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হয় ?
১৮। আটলাণ্টিক চার্টার কোন্ সময় ঘোষণা করা হয় ?
১৯। কোন্ সময় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা হয় ?
২০। কিউবাতে সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতা কে ছিলেন ?

———